ভ্রমণীয়

বনফুল

সাহিত্যম্ । ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট । কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৭০

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

ব্লক ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত
ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
দিলীপ দে
দে প্রিণ্টার্স
১৫৭বি, মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

কড়া নাড়ার শব্দে উঠে বসলাম। শীতকালে এত রাত্রে কে এল আবার!

"কে—"

"আমি, আমি, কপাট খোলো।"

খুললাম। সুইচ টিপে আলোটা জ্বাললাম। দেখি খর্বকায় একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। আজানুলম্বিত গলাবন্ধ খদ্দরের কোট গায়ে। মাথার সামনের দিকটা কেশ-বিরল, চোখ নিষ্প্রভ, ভুরুতে পাক ধরেছে, সমস্ত মুখে বলি-রেখা, সামনে গোটা দুই দাঁত নেই।

"আমার চিঠি পাওনি নিশ্চয়?"

"না।"

"চিতুয়া পোস্ট করেনি তাহলে। শালা ডাকু। নিজে হাতে পোস্ট করলেই ঠিক হ'ত········তাকে দেওয়াটাই ভুল হয়েছিল। ভুল, ভুল, এ জীবনটা ভুল করতে-করতেই কাটল বীরেনবাবু।"

হঠাৎ অর্জুনকাকাকে চিনতে পারলাম আমি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরই চিনিয়ে দিলে তাঁকে। বহুদিনের যবনিকা সরে গেল যেন।

"অর্জুনকাকা! হঠাৎ এত রাত্রে কোথা থেকে?"

"তীর্থে যাচ্ছি। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। শহরে জিনিসপত্রও কিনতে হবে কিছু। তোমাকে এত রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দিলাম বোধ হয়। আমার ধারণা ছিল চিঠি পেয়েছ তুমি।"

"না, না, তার জন্যে কী হয়েছে"—

"হয়নি কিছু। তোমার কাছে খবর না দিয়ে আসবার জোরও আমার আছে। কিন্তু চিতুয়াটার কথাই ভাবছি। এই সব ছোটখাটো ব্যাপার থেকেই মানুষের ভবিষ্যৎ বুঝা যায় কিনা—"

অর্জুনকাকা মাঝে মাঝে কথাবার্তাতেও শুদ্ধ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। 'বুছা' 'দিব' নিয়ে আগে কত হাসাহাসি করেছি আমরা।

"ডাকের গোলমাল হয়েছে হয়তো।"

"না, ওকথা মানব না আমি।"

অর্জুনকাকা বারান্দা থেকে নেমে গেলেন এবং গাড়ি থেকে নিজেই নিজের জিনিসপত্র নামাতে উদ্যত হলেন।

"আপনি ছেড়ে দিন না, গাড়োয়ানই নামাবে এখন।"

"কেন ওকে বেশী পয়সা দিতে যাব মিছামিছি—"

'মিছামিছি'ও অর্জুনকাকার বিশেষত্ব।

"দাঁড়ান, আমার চাকরটাকে ডাকি তাহলে—"

"চাকরকেই বা ডাকবে কেন? আমার গায়ে জোর নাই না কি?"

অবলীলাক্রমে নামিয়ে ফেললেন সব। বিছানা, প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ, লোহার উনুনও একটা। চুক্তিমাফিক গাড়োয়ানকে পাই-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন—"কোন্ ঘরটায় শুব?"

বাইরের দিকে খালি ঘর ছিল একখানা। তাতে একটা চৌকিও ছিল। সেইটেই খুলে দিলাম। অর্জুনকাকা বললেন—"যাও, তুমি শুয়ে পড় এইবার। অনেক রাত হয়েছে। আমি এই চৌকির উপর নিজেই বিছানা বিছিয়ে নিচ্ছি। তুমি যাও।"

"আপনার খাওয়া-দাওয়া?"

"রাত্রে আমি কিছুই খাই না।"

"দু-চারখানা লুচিটুচি ভেজে দিক না, কী আর এমন রাত হয়েছে—"

বিছানা পাততে-পাততে অর্জুনকাকা বললেন—"তোমার সঙ্গে কি আমি লৌকিকতা করছি?"

চুপ করে রইলাম।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "চিতুয়া এবারও ম্যাট্রিক পাস করতে পারেনি, বুঝলে?"

"ও!"

"নিজেই ভুগবে শালা। আমার কী—"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"যাও, আর রাত কোরো না, শুয়ে পড়ো।"

"সত্যিই কিছু খাবেন না?"

"দেখ, বেশী যদি পীড়াপীড়ি কর বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে স্টেশন-প্লাটফর্মে চলে যাব তাহলে।"

বুঝলাম, অর্জুনকাকা বদলাননি। আর দ্বিরুক্তি না করে শুতে চলে গেলাম। শুলাম বটে, কিন্তু ঘুম এল না। অর্জুনকাকার কথাই ভাবতে লাগলাম। অর্জুনকাকার কথা বাবার মুখে খানিকটা শুনেছি—নিজেও দেখেছি খানিকটা। আশ্চর্য জীবন লোকটার। স্বাধীন দেশে জন্মালে দিগ্বিজয় করতে পারতেন। এদেশে কিছু হ'ল না। জাতে জেলে। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। মাথায় করে মাছের ঝুড়ি নিয়ে এসে হাটে বেচতেন আমাদেরই বাড়ির সামনে। আমাদের বাড়ির ঠিক সামনেই হাট বসত। অর্জুনকাকার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যটা এখনও আমার মনে আছে

হাটে প্রচণ্ড একটা গোলমাল উঠল একদিন। চীৎকার চেঁচামেচি কলরব আর্তনাদে সমস্ত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যেন। একটা জায়গায় ভিড়টা জমাট বেঁধে গেল। মনে হতে লাগল তার কেন্দ্রে ভয়াবহ কী যেন একটা হচ্ছে। হঠাৎ ভিড় ঠেলে অর্জুনকাকা বেরিয়ে এলেন। তাঁর বগলে একটা রুইমাছ। বাবা হাসপাতালের বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন। অর্জুনকাকা ছুটে এসে মাছটা দড়াম করে সামনে ফেলে বাবার পা-দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

"আমায় বাঁচান আপনি ডাক্তারবাবু, শালারা আমার সব কেড়ে নিচ্ছে।"

বাবা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

"কি কেড়ে নিচ্ছে? কারা?"

"জমিদারের সিপাহিরা। মাছ কেড়ে নিচ্ছে আমার। রোজই নেয় কিছু-কিছু। আজ এই বড় রুইটা নিতে যাচ্ছিল। দেব না বললাম তো মারলে এক চড়। আমিও ঘুরিয়ে এক চড় মেরেছি শালাকে।"

গুরুতর ব্যাপার। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের বিরুদ্ধে সামান্য জেলের এই বিদ্রোহ হেসে উড়িয়ে দেবার মতো তুচ্ছ ঘটনা নয়। বাবা একটু বিব্রত হ'লেন। সামান্য অবাধ্যতার জন্য এই জমিদার একজন গরিব প্রজার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন কিছুদিন আগে।

"আচ্ছা তুমি চুপ করে বোসো এইখানে।"

বাবার পা ছেড়ে অর্জুনকাকা এক কোণে বসলেন গিয়ে. সিপাহি দু'জনও এল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই।

বাবা জিগ্যেস করলেন, "এর মাছ কেড়ে নিচ্ছিলে কেন তোমরা?"

"এইসাই তো রেওয়াজ হ্যায় হুজুর। মাহিনামে একঠো বড়া মছলি তো উনকো দেনাই চাহিয়ে।"

"নেহি দেগা।"

কোণ থেকে গর্জন করে উঠলেন অর্জুনকাকা।

সিপাহিদের চক্ষু অগ্নি বর্ষণ করতে লাগল।

ডাক্তার বলে' বাবাকে ইতর-ভদ্র সকলেই খাতির করত। তাই সিপাহিরা আত্মসংবরণ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা সিপাহিদের বললেন, "আচ্ছা, তোমরা যাও। তোমাদের মালিককে যা বলবার আমি বলব। একে তোমরা কিছু বোলো না এখন।"

সিপাহিরা চলে গেল।

জমিদারও বাবাকে খুব খাতির করতেন। অর্জুনকাকার কিছু হ'ল না। বাবার খাতিরে জমিদার তার মাছ নেওয়াই মাপ করে দিলেন। অতিশয় সামান্য ব্যাপার। জমিদাররা মানীর মান রাখবার জন্য হামেশাই এরকম করে থাকেন। অর্জুনকাকার কিন্তু তাক লেগে গেল। অত বড় দুর্ধর্ষ রাবণ মিশির লিকলিকে রোগা এই ডাক্তারবাবুটির কাছে একবারে কেঁচো! উঃ, বিদ্যার কী প্রতাপ! কী হবে পয়সায়, কী হবে জমিদারিতে, বিদ্যাই আসল জিনিস। বশিষ্ঠের তপোবন দেখে বিশ্বামিত্রের যে অবস্থা হয়েছিল অর্জুনকাকার অনেকটা তাই হ'ল।

উক্ত ঘটনার দিন-সাতেক পরে অর্জুনকাকা একদিন এসে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বাবাকে বললেন—"আমার একটা আরজি আছে ডাক্তারবাবু।"

"কী বল ?"

"আমি কিছু লিখাপড়া করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

এইবার বাবার তাক লাগল।

"তুমি লেখাপড়া করবে ! তোমার সংসার দেখবে কে ?"

"আমার স্ত্রী। আমার জমিজমা কিছু আছে, আমার স্ত্রী ধান কুটে, মুড়ি ভেজে—চলে যাবে কোনো রকমে। আমিও রোজকার করব কিছু।"

"ক'টি ছেলেপিলে তোমার ?"

"সাতটি মেয়ে, ছেলে নাই।"

বাবার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু অর্জুনকাকার চোখে জ্বলন্ত আগ্রহ দেখে হাস্য সংবরণ করতে হ'ল তাঁকে।

"পড়াশোনা করবে ! সে তো ভালো কথাই। কিন্তু করবে কী করে ? স্কুলে তো আর নেবে না তোমায়—"

"নেবে না ?"

"এ বয়সে কি আর স্কুলে নেয় !"

"তব আমি পড়ব। আপনি যদি একটু দয়া করেন তাহলে হয়।"

"কী করব বল ?"

"আপনার চরণে যদি আশ্রয় দেন একটু। আপনার হাতায় আমি ছোট কুঁড়ে বেঁধে থাকব, আর আপনার ছেলেদের কাছেই পড়ব, তাদের পুরনো বই-টই নিয়ে ..."

বাবা একটু চুপ করে রইলেন। অর্জুনকাকার আগ্রহ দেখে তাঁকে তিনি নিরস্ত করতেও পারছিলেন না, অথচ এরকম একটা অসম্ভব প্রস্তাবে সায় দিতেও কেমন যেন লাগছিল তাঁর। একটু চুপ করে থেকে দ্বিধাভরে শেষে বললেন, "বেশ, পার তো আমার আপত্তি কি—"

তার পরদিনই বাঁশ খড় দড়ি কাটারি শাবল কোদাল নিয়ে অর্জুনকাকা এসে পড়লেন, দেখতে-দেখতে ছোট কুঁড়েঘরটি বানিয়ে ফেললেন। আমরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, আর সেইদিন থেকে তিনি হলেন আমাদের অর্জুনকাকা। আমাদের যে মাস্টারমশাই পড়াতেন, তিনিই

অর্জুনকাকার অক্ষর পরিচয় করিয়ে হাতেখড়ি দিয়ে দিলেন। আমাদেরই প্রথম ভাগ এবং ফার্স্ট বুক নিয়ে তাঁর পড়া শুরু হয়ে গেল। কিন্তু দেখতে-দেখতে আমাদের ছাড়িয়ে গেলেন তিনি।

অর্জুনকাকা খুব ভোরে উঠতেন। এত ভোরে যে আমরা টেরই পেতাম না। আমরা উঠে দেখতাম তিনি কাজে বেরিয়ে গেছেন। মজুরের কাজ করে বেড়াতেন দিনের বেলায়। যা পেতেন স্ত্রীকে দিয়ে আসতেন। ফিরতেন বিকেলে। বিকেলে এসেই তিনি খাওয়া-দাওয়া করতেন। প্রায়ই রাঁধতেন না। দই চিঁড়ে কলা প্রিয় খাদ্য ছিল—ছাতুও খেতেন কখনও কখনও। খেয়ে উঠেই হাতের লেখা লিখতেন দিনের আলো থাকতে-থাকতে। সন্ধ্যা হলে প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসতেন। রেড়ির তেলের বেশ বড় একটা প্রদীপ ছিল তাঁর। ভোরে কাজে বেরোবার আগে তিনি যে পড়াটা পড়তেন তা আমরা দেখতে পেতাম না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যেভাবে পড়তেন তার থেকে তা আন্দাজ করে নেওয়া অসম্ভব ছিল না। শিরদাঁড় একটুও বেঁকতে দেখিনি কখনও। টেবিল-চেয়ার ছিল না, আমাদের মতো চাপটালি খেয়েও বসতে পারতেন না তিনি। উবু হয়ে বসতেন। সামনে থাকত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স, তার উপর খবরের কাগজ পাতা। তাতেই একটি ছোট ইঁটের উপর তিনি প্রদীপটি রাখতেন। সেই কেরোসিন কাঠের বাক্সটি একাধারে ছিল তাঁর টেবিল এবং শেলফ্। নীচের ফাঁকটায় তাঁর বই খাতা দোয়াত কলম থাকত। কী সুন্দরভাবে যে গুছিয়ে রাখতেন সেগুলিকে! খাগের কলমটি, পেন্সিলটি নিখুঁতভাবে কাটা। আমাদের পেন্সিল-কলমও তিনিই বেড়ে দিতেন। পিতলের দোয়াতটি ঝকঝক করত। প্রত্যেক বইয়ে কী সুন্দর মলাট দিতেন!

কিছুক্ষণ পড়বার পরই কিন্তু ঘুম পেত তাঁর। কিন্তু ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করবার লোক অর্জুনকাকা নন। উঠে চা করতেন ঘুঁটের উনুন জ্বেলে। ঘুঁটের ধোঁয়ায় শুধু ঘুম নয়, মশাও পালাত। একটি ঘটি চা খেতেন তিনি, এক-আধ কাপ নয়। রাত্রে আর কিছু খেতেন না। চা খেয়ে আবার শুরু করতেন পড়া। কিছুক্ষণ পরে আবার ঢুল ধরত। চোখে সর্ষের তেল দিতেন। মাথার চুল ধরে টানতেন। ঠাসঠাস করে নিজের গালে চড়

মারতেন কখনও-কখনও। আমরা হাসতাম। কারণ অর্জুনকাকার সাধনার ঠিক স্বরূপটি বোঝাবার মতো বয়স হয়নি আমাদের তখনও। এখন বুঝতে পারি, পুরাকলে শিক্ষার্থী যেমন গুরু-গৃহে বাস করে' অধ্যয়ন করত, অর্জুন-কাকাও তেমনি আমাদের বাড়িতে থেকে পড়তেন। অর্জুনকাকার গুরুস্থানীয় হবার মতো লোক অবশ্য কেউ ছিল না, তিনি নিজেই নিজের গুরু ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনোভাব ছিল সেকালের বিদ্যার্থীদের মতো। ওরকম নিষ্ঠাও আর কখনও দেখিনি। মাঝে মাঝে দু-একদিনের জন্য বাড়ি যেতেন অবশ্য, কিন্তু তা দু-একদিনের জন্যই। মাসের অধিকাংশ দিনই পড়াশোনা করতেন তাঁর কুঁড়েঘরে বসে। এইভাবে পড়ে বছর-দেড়েকের মধ্যে বাংলায় সীতার বনবাস এবং ইংরাজিতে রয়াল রীডার নম্বর ফোর পড়ে ফেললেন তিনি, অঙ্কও শিখলেন কিছু-কিছু। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক বেশ কষতে পারতেন। তাঁর উৎসাহ দেখে স্কুলের মাস্টার পণ্ডিত সবাই সাহায্য করতেন তাঁকে। অর্জুনকাকা বিনামূল্যে কারও সাহায্য নেবার লোক নন। নানাভাবে প্রতিদানও দিতেন তিনি। দইটা মাছটা কলাটা মুলোটা তো দিতেনই, সেবাও করতেন। কারও পা টিপে দিতেন, কারও কাপড় কেচে দিতেন, কারও বাজার করে দিতেন, কিছুতেই আপত্তি ছিল না তাঁর।

এইভাবেই হয়তো আরও কিছুদিন চলত কিন্তু হঠাৎ একদিন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘ'টে সব ওলটপালট হয়ে গেল। হাসপাতাল পরিদর্শন করতে এক সাহেব সিভিল সার্জন এলেন একদিন। সকালে স্টেশনের কুলি তাঁর জিনিসপত্র বয়ে এনেছিল, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ফেরবার সময় জিনিস বইবার লোক পেলেন না সাহেব। হাসপাতালের চাকরটা অসুস্থ, আমাদের চাকরও বাড়ি গিয়েছিল। কাছে কুলীজাতীয় কাউকে না পেয়ে সাহেব (এবং বাবাও বিপন্ন বোধ করছিলেন। স্টেশন বেশ একটু দূরে, সাহেবের মালও নেহাত হালকা নয়। অর্জুনকাকা নিজে কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে দড়ি পাকাচ্ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি বসে-বসে দড়ি পাকাতেন এবং প্রতি হাটে তা বিক্রি করতেন। বাবা গিয়ে তাঁকে বলতেই তিনি সাহেবের জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। শুধু তাই

নয়, এগিয়ে এসে সাহেবকে সেলাম করে বললেন,—Yes, sir, I shall carry your things most gladly. অর্জুনকাকার মুখে সাহেব ইংরেজী শুনবেন প্রত্যাশা করেননি, শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বাবার মুখে অর্জুনকাকার ইতিহাস এবং অধ্যবসায়ের গল্প শুনে আরও মুগ্ধ হলেন। স্টেশনে মালপত্র নামাতেই সাহেব তাঁকে একটি টাকা দিতে গেলেন। অর্জুনকাকা পুনরায় সেলাম করে বললেন,—Thank you sir. I am labourer, no doubt, but I shall not accept anything from you.

বিস্মিত সাহেব প্রশ্ন করলেন—Why ?

"You are our Doctor Babu's honoured guest."

সাহেব অত্যন্ত খুশী হয়ে গেলেন। অর্জুনকাকা জিনিসপত্র নামিয়ে চলে যাবার পর সাহেব বাবাকে বললেন, "ও যদি চায়, আপনি ওকে অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসাবে ভরতি করে নিন। কিছুদিন পরে পরীক্ষা দিয়ে পাকা ড্রেসার হোক। তারপর ওকে আমি কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্যেও স্কলারশিপ যোগাড় করে দেব।"

খবরটা শুনে অর্জুনকাকা অবাক হয়ে গেলেন। একটু দমেও গেলেন। একাগ্রচিত্তে তিনি যে পথে সবেগে চলছিলেন হঠাৎ তাতে বাধা পেয়ে এবং সে বাধা দুরতিক্রম্য অনুভব করে (স্বয়ং ডাক্তারবাবু যখন তাঁকে ড্রেসার হতে বলেছেন তখন তা দুরতিক্রম্য ছাড়া আর কী) অর্জুনকাকার এমন অদ্ভুত একটা ভাবান্তর হ'ল যা প্রায় অবর্ণনীয়। হতাশা, জেদ, বাধ্যতা, আত্মসমর্পণ, ক্ষোভ এবং এই সবটার জন্য দায়ী যে অদৃশ্য শক্তি তার বিরুদ্ধে আক্রোশ—সমস্তটা সমবেতভাবে ফুটে উঠল তাঁর চোখে-মুখে।

তাঁর মুখের এ রকম ভাবান্তর আরও কয়েকবার লক্ষ্য করেছিলাম আমি। অর্জুনকাকা আমাদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন তাঁর ঘরে একা থাকতেন আমি মাঝে মাঝে ফুটো দিয়ে (তাঁর দরমার ঝাঁপে অসংখ্য ফুটো ছিল) তাঁকে লক্ষ্য করতাম। তাঁর মুখে এরকম ভাবান্তর হতে অনেকবার দেখেছি। এর চেয়েও বেশী অস্থির হতেও দেখেছি। হঠাৎ তাঁর চোখ-মুখ কেমন যেন হয়ে যেত, উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতেন, মনে হ'ত জিবটা যেন চিবুচ্ছেন। নাকটা খুব

জোরে কুঁচকে খুব ঘনঘন চিবুতেন মনে হ'ত। ছোট একটা হাত-আয়না ছিল তাঁর। চালে গোঁজা থাকত সেটা। পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ সেইটে পেড়ে ভ্রূকুটি সহকারে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকেই চেয়ে থাকতেন খানিকক্ষণ। অতীত জীবনে যে সব দুরতিক্রম্য বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারেননি, অন্যায়ভাবে নিয়তির কাছে যতবার পরাভূত হয়েছেন, তার সমস্ত পুঞ্জীভূত গ্লানি তাঁকে মাঝে মাঝে পাগল করে তুলত বোধ হয়। আয়নার দিকে চেয়ে নিজেই নিজেকে ভ্যাংচাতেন। হয়তো কথঞ্চিৎ শান্তি পেতেন তাতে।

বাবার কথা শুনে বললেন, "কাল থেকে ঘা ধোয়াব! সে কী! তিন-তিনখানা ডিক্শনারি আনতে দিয়েছি আমি—"

"অত ডিক্শনারি কী হবে?"

"মুখস্থ করব।"

"মুখস্থ করবে? কি হবে ডিক্শনারি মুখস্থ করে? তা ছাড়া অত পড়েই বা তোমার লাভ কি, পরীক্ষা তো তোমায় দিতে দেবে না।"

"দেবে না? কেন?"

"এই নিয়ম। প্রাইভেটলি মেয়েরা পরীক্ষা দিতে পারে। আর শিক্ষকরা ....তাও তিন বছর চাকরি করার পর।"

অর্জুনকাকা বললেন—"শুনেছি হাই স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক দেওয়া যায়।"

"তা যায় বটে। কিন্তু তার পর আর পারবে না, কলেজে ভর্তি হতে হবে। আই. এ. পাস করতে-করতে বুড়ো হয়ে যাবে। তাতে লাভটা হবে কী! তার চেয়ে এইতেই লেগে পড়। কম্পাউণ্ডার হতে পার যদি কাজ হবে একটা।"

অর্জুনকাকা চুপ করে রইলেন।

পরদিন থেকেই অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসারের পদে বাহাল হয়ে গেলেন তিনি। ড্রেসার করিম মিঞার কাছে প্রথম পাঠ নিলেন ব্যাণ্ডেজ পাকাতে হয় কি করে। করিম মিঞার খুব সুবিধে হ'ল। ছা-পোষা লোক তিনি। মুরগী, ছাগল, গোটা দুই বিবি এবং গোটা বারো ছেলে-মেয়ে নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত

থাকতে হ'ত তাঁকে যে হাসপাতালের কাজে মন দেবার অবসর পেতেন না তিনি। বাবার কাছে প্রায়ই বকুনি খেতেন। অর্জুনকাকাকে শাকরেদ পেয়ে বেঁচে গেলেন তিনি। অর্জুনকাকাই সমস্ত কাজ করতে লাগলেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্যাণ্ডেজ পাকানো, ছুরি-কাঁচি পরিষ্কার করা, খাতায় রুলটানা, টেবিল ঝাড়া—সমস্ত হয়ে যেত। হাসপাতালের চাকরটার আসতে দেরি হলে তার কাজও করে দিতেন। কম্পাউণ্ডার হারাধনবাবুও প্র্যাক্টিস করবার সময় পেলেন। স্টক মিকশ্চার, স্টক মলম অর্জুনকাকাই করতে শিখে গেলেন অল্পদিন পরে। সার্জিকাল যন্ত্রপাতি নিয়মিত পরিষ্কার করতেন, লেবেল ময়লা হয়ে গেলে পরিষ্কার অক্ষরে লিখতেন সেগুলি, এমন কি, বাবার হয়ে রিটার্নও করে' দিতেন প্রত্যহ। অর্জুনকাকা হাসপাতালের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠলেন দেখতে-দেখতে। হাসপাতালের চেহারাই বদলে গেল। অর্জুনকাকার দৈনন্দিন কার্যক্রম বদলে গেল অবশ্য খানিকটা। মজুরি খাটবার জন্যে আর বেরুতেন না। অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসাবে সিভিল সার্জন যে বেতন তাঁকে মঞ্জুর করেছিলেন যদিও তা সামান্যই কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন তিনি। লেখাপড়া বন্ধ করেননি, বরং বাড়িয়েছিলেন। বাংলায় বসুমতী সংস্করণের বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে অনেক গ্রন্থাবলীই কিনে পড়েছিলেন তিনি। ইংরেজীতে রবিন্সন ক্রুশো, গ্যালিভার্স ট্রাভল্‌স, পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্ জাতীয় বই কিনে শেষ করতে লাগলেন একটার পর একটা। ডিক্‌শনারি মুখস্থ করবার উদ্যমটা নিয়োজিত করতে হ'ল ড্রেসারি বিষয়ক জ্ঞান-আহরণে। কোর্স ছিল অবশ্য ছোট একখানা চটি বই। কিন্তু ওটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকবার লোক অর্জুনকাকা নন। তিনি সেই বইটা আগাগোড়া মুখস্থ তো করলেনই, সে বিষয়ে আরও যে সব বই বাজারে ছিল তাও আনিয়ে পড়ে ফেললেন একে একে। এতে কিন্তু ফল শেষ পর্যন্ত ভালো হ'ল না। কারণ সাহেব বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় এসেছিলেন অন্য একজন লোক।

তিনি এত বড় একজন দিগগজকে পরীক্ষার্থীরূপে পাবেন আশা করেননি। কোনো-কোনো বিষয়ে অর্জুনকাকার জ্ঞান তাঁর চেয়েও বেশী এটা বরদাস্ত করা শক্ত হ'ল তাঁর পক্ষে। তিনি সহজ সরল উত্তর প্রত্যাশায়

করেছিলেন। কিন্তু অর্জুনকাকা অনেক বই পড়েছেন, একই প্রশ্নের নানা বিচিত্র উত্তর জানা ছিল তাঁর। প্রত্যেক ব্যাণ্ডেজের উদ্ভব, উপযোগিতা, ইতিহাস, সুবিধা-অসুবিধা তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন তিনি। বড় বেশী কথা বলছে দেখে পরীক্ষক ধমক দিলেন। অর্জুনকাকা ধমকে নিরস্ত হবার লোক নন। রাত জেগে অনেক বই পড়েছেন, সমানে তর্ক করতে লাগলেন। পরীক্ষকের সঙ্গে তর্ক করা ডাক্তারি লাইনে শ্রেষ্ঠতম অপরাধ। ফেল হয়ে গেলেন তিনি। ফেল হয়ে অর্জুনকাকা ফিরে এলেন। সেদিনও ওইরকম মুখভাব দেখেছিলাম তাঁর। হতাশা, জেদ, ক্ষোভ এবং সমস্তটার জন্য দায়ী যে দুরতিক্রম্য নিয়তি তার বিরুদ্ধে আক্রোশ—এই সবগুলো একসঙ্গে যেন ফুটে উঠেছে তাঁর মুখভাবে, চোখের দৃষ্টিতে। সমস্ত দিন ঘর থেকে বেরুলেন না। মাঝে মাঝে সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠেছে, চালে-গোঁজা আয়নাটা পেড়ে অতি কুৎসিতভাবে ভ্যাংচাচ্ছেন নিজেকে। অবশ্য ওই একদিন মাত্র; পরদিন থেকেই আবার কাজে লেগে গেলেন পূর্ণ উদ্যমে। যেন কিছুই হয়নি।

পরের বার পাস করলেন। কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্যে স্কলারশিপ পেলেন। কিন্তু একটা মুশকিল হ'ল। কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্য কটক যেতে হবে। পরিবার রেখে যাবেন কার কাছে? দিনকয়েকের ছুটি নিলেন। ছুটির পর ফিরে এসে কিন্তু তিনি যে খবর দিলেন তা অভাবনীয়। পাশের গ্রামেই অর্জুনকাকার স্বজাতি বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল একঘর। বেশ ভালো অবস্থা, ছোটোখাটো জমিদারি আছে।

তাঁর সাত ছেলে। তিনি নাকি তাঁর সাত ছেলের সঙ্গে অর্জুনকাকার সাত মেয়ের বিয়ে দিতে চান। হাসপাতালে চাকরি হওয়াতে এবং আমাদের সম্পর্কে আসাতে অর্জুনকাকার একটা খ্যাতি রটে গিয়েছিল নিজেদের সমাজে। এ প্রস্তাবে আনন্দিত হওয়ার কথা, কিন্তু অর্জুনকাকা এতে বিপদ বোধ করলেন।

"এ এক মহা আফৎ হ'ল"—

অর্জুনকাকা 'আপদ'-কে 'আফৎ' বলতেন।

বাবা বললেন, "আমার তো মনে হচ্ছে ভালোই হ'ল। মেয়েদের বিয়ে

দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে, পড়তে চলে যাও তুমি। মেয়েরা তোমার সুখেই থাকবে। ওরা বড়লোক—"

"বড়লোক বলেই আমার আপত্তি। বড়লোক মানেই পাজি, বদমাশ, চোর, লম্পট, লুচ্চা—"

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অর্জুনকাকা।

"আপনি তো সবই জানেন ডাক্তারবাবু। এই জমিদার শালারাই দেশকে চুষে খেয়ে ফেললে। আমার কী হাল হয়েছিল আপনি তো সবই জানেন, আপনি না থাকলে আমাকে কাঁচাই খেয়ে ফেলত শালারা—"

"সবাই খারাপ নয়। এরা লোক ভালো।"

"আপনি বলছেন?"

অর্জুনকাকার মুখভাব আবার সেইরকম হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। বড়লোকদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার ইচ্ছে নেই তাঁর, কিন্তু বাবা যখন এতে মত দিচ্ছেন তখন তা অমান্য করবার সাধ্যও নেই। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি!

বাবা বললেন, "তোমার মেয়েদের যদি বিয়ে না দাও তাহলে কার কাছে রেখে যাবে এদের? মাসখানেকের মধ্যেই তো কটক যেতে হবে তোমাকে।"

"তার জন্যে আমার ভাবনা ছিল না, আমার এক খুড়তুতো ভায়ের কাছে রেখে যাব ভেবেছিলাম। তাকে আনবার জন্যেই কসবায় গিয়েছিলাম ছুটি নিয়ে।"

"তোমার যা খুশি করতে পার। কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে যাওয়াই ভালো"—এই বলে বাবা উঠে গেলেন। অর্জুনকাকা চুপ করে বসে রইলেন। ক্রমশ তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হতে লাগল। চোখদুটো নিষ্পলক হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পলক ফেলে জিবটা চিবুতে শুরু করলেন তিনি।

বিয়ের দিনও এক কাণ্ড ঘটল। অর্জুনকাকা তাঁর জমিদার বেয়াইকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি গরিব মানুষ, বেশী বরযাত্রীর হাঙ্গামা বরদাস্ত করবার শক্তি নেই তাঁর, কুড়িজনের বেশী বরযাত্রী যেন আসা না হয়। বিয়ের দিন দেখা গেল পঞ্চাশটা ঢোল, কুড়িটা রাম-শিঙে, পনরটা কাঁসি

এবং দশটা শানাই সমভিব্যহারে এক বিরাট জনতা চতুর্দিক সচকিত করে অর্জুনকাকার বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অর্জুনকাকা সোজা থানায় চলে গেলেন। দারোগাকে গিয়ে বললেন—হুজুর, আমার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, বাঁচান আমাকে। দারোগা সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে সত্যিই গিয়ে হাজির হয়েছিলেন অকুস্থলে। ব্যাপারটা অবশ্য পরিহাসেই পর্যবসিত হ'ল শেষ পর্যন্ত। অর্জুনকাকার বেয়াই শুধু লোকজনই আনেননি, তাদের বসবার, শোবার, খাবার সমস্ত আয়োজনই সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন। অর্জুনকাকার বাড়ির সামনের মাঠে তাঁর প্রকাণ্ড তাঁবু পড়েছিল। অর্জুনকাকা কিন্তু এতে খুশী হলেন না। অপমানিত বোধ করলেন। ধনী-হস্তের এই অভিনব অস্ত্রে আহত হ'য়ে চুপ ক'রে রইলেন। কারণ, এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলে না। গুম হয়ে বসে রইলেন কেবল। হয়তো নির্জনে মুখ-ভঙ্গী করে নিজেই ভেংচেছিলেন, কিন্তু সে খবর আমরা জানি না।

মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেল। অর্জুনকাকা নিজের স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে কটক চলে গেলেন।

এর পর বছর দুই অর্জুনকাকার কোনো খবর পাইনি। মাইনার পাস ক'রে আমরা শহরের হাই স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলাম। অর্জুনকাকা কটকে কম্পাউণ্ডারি পড়ছেন, এইটুকু জানতাম। মাঝে কার মুখে যেন শুনেছিলাম অর্জুনকাকা সেখানেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বছর দুই পরে অর্জুনকাকা হঠাৎ এসে হাজির হলেন একদিন। সঙ্গে তাঁর সাত জামাই। তাদের স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন। আমাদের অনুরোধ করলেন আমরা যেন একটু দেখা-শোনা করি। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বললেন, "বলছি বটে, কিন্তু কিচ্ছু হবে না। বড় বিলাসী। আর আফৎ জুটেছে এক পিসী—"

মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বসে রইলেন চুপ ক'রে। পরের ট্রেনেই চলে গেলেন।

আমরা বোর্ডিংয়ে থাকতাম। অর্জুনকাকার জামাইরা একটা বাসা ভাড়া ক'রে রইল। সঙ্গে এল এক পিসী। তিনিই হলেন গার্জেন। জমিদারি থেকে প্রচুর দুধ দই মাছ ঘি আম কাঁঠাল সরবরাহ হতে লাগল, স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক তাদের প্রাইভেট পড়াতে লাগলেন, স্থানীয় মনোহারী

দোকানটার বিক্রি বেড়ে গেল, অর্জুনকাকার জামাইদের নিত্য-নতুন সাজসজ্জায় আমরা ঈর্ষান্বিত হতে লাগলাম। কিন্তু অর্জুনকাকা যা বলেছিলেন শেষ পর্যন্ত তাই হ'ল। অর্থাৎ জামাইদের কিচ্ছু হ'ল না। জামাইরা প্রমোশন পেলে না। একদিন হঠাৎ আবার শুনলাম অর্জুনকাকা এসেছেন। শুধু এসেছেন নয়, এসে গো-বেড়েন করেছেন প্রত্যেকটি জামাইকে। বেচারাদের আর্তনাদে পাড়ায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে নাকি! দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি বাইরের বারান্দায় ভাঙা আয়না, চিরুনি, স্নো, পাউডার, সিগারেটের বাক্স, কয়েকটা শৌখীন জামা প্রভৃতি ইতস্তত ছড়ানো। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। বাইরের দিকে একটা জানলা ছিল। উঁকি দিয়ে দেখি অর্জুনকাকা পিছনে দু'হাত রেখে ক্রমাগত পায়চারি করছেন আর জিব চিবুচ্ছেন। মুখভাব ভয়াবহ। চুপিচুপি সরে পড়লাম। অর্জুনকাকা সেইদিনই চলে গেলেন। তার পরদিন জামাইরাও স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে চলে গেল। এ নিয়ে শুনেছি বেয়াইয়ের সঙ্গে ঘোরতর মনোমালিন্য হয়েছিল অর্জুনকাকার, কিন্তু বাবা মিটিয়ে দিয়েছিলেন সব।

আমি ক্রমশ ম্যাট্রিকুলেশন পাস ক'রে কলেজে ভরতি হলাম। তারপর আই. এস-সি. পাস ক'রে গেলাম মেডিকেল কলেজে। অর্জুনকাকার খবর অনেকদিন পাইনি। এইটকু শুধু শুনেছিলাম যে, তিনি কম্পাউণ্ডারি পাস ক'রে ডিস্ট্রিক বোর্ডের নানা হাসপাতালে চাকরি ক'রে বেড়াচ্ছেন। একবার ছুটিতে বাড়ি এসে দেখলাম, অর্জুনকাকা আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। আমার জন্যেই বিশেষ ক'রে ছুটি নিয়ে এসেছেন তিনি। কেন এসেছেন শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমার কাছে তিনি অ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং ফার্মাকোলজি বিষয়ে জ্ঞান-আহরণ করতে চান।

"তুমি তো পড়ছ এসব, আমাকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দাও।"

বলা বাহুল্য, বিপন্ন হলাম। কিন্তু অর্জুনকাকাকে নিরস্ত করার সাধ্য আমার ছিল না। একবার শুধু ইতস্তত করে বললাম, "এখন আর কি করবেন এসব পড়ে?"

তখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। আমার কথা শুনে বিস্ময়-

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে, যেন আমি হাস্যকর অদ্ভুত কিছু বলেছি একটা।

"কী করব! বাঃ!"

একটু থেমে তারপর বললেন, "শিখব। শিখতে দোষ কি আছে! তা ছাড়া চাকরি করার আর ইচ্ছা নাই। সব শালা চোর। প্র্যাকটিস করব ঠিক করেছি। আমাকে ডাক্তারিটা ভালো করে শিখিয়ে দাও তুমি।"

যতদিন বাড়িতে ছিলাম অর্জুনকাকার সঙ্গে পড়তে হ'ত। নিজের অক্ষমতায় লজ্জা হ'ত আমার। ওই বৃদ্ধের উৎসাহের সঙ্গে কিছুতেই পাল্লা দিতে পারতাম না। প্রত্যহ রাত্রে এগারোটায় শুয়ে ভোর চারটের সময় ওঠবার শক্তি ছিল না আমার। কিন্তু অর্জুনকাকা নাছোড়। রোজ ডাকাডাকি ক'রে ঠিক তুলতেন আমাকে। কেবল দুপুরটা ছুটি পেতাম। অর্জুনকাকা সেই সময় আমাদের বাড়ির বাইরের দিকে একটা ছোট ঘরে আশ্রয় নিতেন। খিল দিতেন ভেতর থেকে। আমি মনে করতাম ঘুমোন বোধ হয়। একদিন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি পিছনে দু'হাত রেখে পরিক্রমণ করে বেড়াচ্ছেন সারা ঘরটা। জিব চিবুচ্ছেন। ক্ষোভ দুঃখ ঘৃণা ব্যঙ্গ মূর্ত হয়ে উঠেছে সমস্ত মুখে। হাতে ছোট আয়নাখানা। মাঝে মাঝে সেটা তুলে ধরেছেন মুখের সামনে আর ভ্যাংচাচ্ছেন নিজেকে।

ছুটি ফুরোতে আমি পালিয়ে বাঁচলাম। কোলকাতায় ফিরেই কিন্তু অর্জুনকাকার বড় বড় স্পষ্টাক্ষরে লেখা চিঠি পেলাম একখানা—"অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি এবং মেটেরিয়া মেডিকা বিষয়ক বাংলা ভাষায় এবং সহজবোধ্য ইংরাজী ভাষায় লেখা যত বহি সংগ্রহ করিতে পার অবিলম্বে আমার নামে ভি. পি. যোগে পাঠাইয়া দিও।" যা পেলাম পাঠিয়ে দিলাম।

কিছুদিন পরে খবর পেলাম অর্জুনকাকা সত্যিই চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছেন। তারও কিছুদিন পরে আমার 'মেসে' এসে হাজির হলেন একদিন। সঙ্গে ছ-সাত বছরের একটি ছেলে। বললেন—"এটি আমার নাতি। আমার মেয়ের ছেলে। একে একটা ভালো স্কুলে ভরতি করব বলে এনেছি। ওখানে কিছু হবে না। তুমি একটা ভালো স্কুল

বেছে দাও। শুনেছি, মর্টন স্কুলে খুব কড়া শাসন, সেখানে দিলে কেমন হয়?"

"কি হবে অত কড়া শাসনে রেখে?"

"তুমি বুঝ না, কড়া শাসনই দরকার। তা না হলে এসব ছেলের কিছু হবে না।"

তারপর একটু হেসে কবি হেমচন্দ্রের সাহায্য নিয়ে বললেন, "হেঁ হেঁ এস, দৈত্য নহে তেমন—"

চকিতের মধ্যে মুখের পেশীগুলো কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল জিবটাও যেন নড়ে উঠল মুখের মধ্যে একবার। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য।

ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী নাম তোমার?"

"চিতুয়া।"

অর্জুনকাকা ধমক দিয়ে উঠলেন।

"চিত্তরঞ্জন বলতে পার না?"

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—"এমন অসভ্য এরা, ভালো একটা নাম রাখলাম, চিত্তরঞ্জন, সে নামকে করে ফেললে চিতুয়া। সবাই ডাকছে চিতুয়া, চিতুয়া। চিত্তরঞ্জন শব্দ মুখ দিয়ে বেরই হয় না, কি করবে বেচারারা—"

অর্জুনকাকার ওপরের ঠোঁটটা একটু কেঁপে থেমে গেল।

চিত্তরঞ্জনকে মিত্র ইনস্টিট্যুশনে ভরতি করে দিলাম।

মর্টনের উপরই অর্জুনকাকার ঝোঁক বেশী ছিল, কিন্তু আমি মানা করতে আমার কথাটা রাখলেন। যাবার সময় ব'লে গেলেন—"টাকার কোনো অভাব হবে না, এর বাবা না দেয় আমি টাকা দেব, কিন্তু পড়াশোনার ভালো ব্যবস্থা হওয়া চাই। বিলাসিতা না করে সেইটি দেখো—"

আমি যতদিন কোলকাতায় ছিলাম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম চিতুয়া যাতে চিত্তরঞ্জন নামের মর্যাদা অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিছুতে কিছু হ'ল না। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন প্রতিকূলতা করতে লাগল। চুম্বক যেমন লৌহকণা আকর্ষণ করে, চিতুয়া তেমনি নানা কুসঙ্গী জোটাতে লাগল তার

চারিদিকে। ক্লাস-প্রমোশন অবশ্য পেল, কিন্তু তা নিজের জোরে নয়, আমার তদ্বিরে।

এর পর অর্জুনকাকার যে স্মৃতিটা আমার মনে পড়ছে তা আমার বিলেত যাওয়ার ঠিক আগের ঘটনা। ভালো ডাক্তার হতে হলে এখানকার ডিগ্রীই যে পর্যাপ্ত নয়, এ ধারণা তখন আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। এখন যদিও ধারণাটা বদলেছে, তখন কিন্তু নামের পিছনে একটা বিলিতি ডিগ্রী লাগাবার জন্যে লোলুপ হ'য়ে উঠেছিলাম। বাবাকে বললাম। তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন একটু। ছেলেকে বিলেতে পাঠাবার সঙ্গতি তাঁর ছিল না। কিন্তু আমাকে সোজা 'না'-ও বলতে পারলেন না। ছেলে পড়তে চাইছে, অর্থাভাবে তার পড়া হবে না, ব্যাপারটা কষ্টদায়ক হয়ে উঠল তাঁর কাছে। তিনি ধারের চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় আমাদের এক আত্মীয় এসে খবর দিলেন যে, একজন বড়লোক আমার বিলেত যাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করতে প্রস্তুত আছেন, আমি যদি বিলেত যাওয়ার পূর্বে তাঁর মেয়েটিকে বিয়ে করি। আমরা চিরকাল পণ-প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে এসেছি, সুতরাং এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারলাম না। এই সব নিয়ে বাড়িতে আলাপ-আলোচনা চলছে, হঠাৎ অর্জুনকাকা এসে উপস্থিত হলেন। আমি বাড়ি এসেছি, খবর পেলেই তিনি আসতেন এবং ডাক্তারির নানা তথ্য আহরণ করতেন আমার কাছ থেকে। তিনি আমাদের বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও শুনলেন সব। শুনে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। সবাই চলে গেলে আমাকে বললেন, "বিয়ে করে বিলেত যাও না, ভালোই তো। শ্বশুরের টাকা নিতে তোমার আপত্তি কেন?"

"ওর মধ্যে বড়লোকের দম্ভ প্রচ্ছন্ন আছে একটা, তা আমি সহ্য করতে পারব না।"

"বাঃ—"

অর্জুনকাকা প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন, "বিলেত যেতে কত টাকা লাগে?"

"পাঁচ-ছ হাজার।"

"মোটে? আমি দেব তোমাকে টাকা।"

"আপনি?"

"হ্যাঁ—ছ হাজার টাকা পোস্টাপিসে আছে আমার। কালই বের করে আনতে পারি। তুমিই নাও টাকাটা। তোমাদের জন্যই তো আমার সব। আমার তো কিছুই ছিল না।"

চুপ করে রইলাম।

"কাল তাহলে টাকাটা বের করি?"

"না, থাক।"

"কেন, আপত্তি করছ কেন?"

"থাক না আপনার টাকা। আপনার নাতিরা মানুষ হয়নি এখনও।"

"হবেও না। সব শালা গুণ্ডা হচ্ছে। তা ছাড়া ওদের টাকার অভাব কী? ওদের আমি দেব না কিছু। তুমিই নাও, ভালো কাজে খরচ হলে তৃপ্তি হবে আমার। কি বল, বের করি?" অর্জুনকাকার চোখে আগ্রহ ফুটে বেরুতে লাগল যেন।

"না, থাক।"

"কেন, আমাকে পর ভাবছ?"

একটু মুচকি হেসে আমি উঠে গেলাম। অর্জুনকাকা একা বসে রইলেন। ফিরে এসে দেখি তিনি পায়চারি শুরু করেছেন। উত্তর দিকের বারান্দাটায় ক্রমাগত চক্কোর দিচ্ছেন। পিছনে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, ভ্রূকুটিকুটিল মুখ, চোখের দৃষ্টি দিয়ে যা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তা অবর্ণনীয়। আমাকে দেখতে পেলেন না, আমিও স'রে গেলাম সেখান থেকে।

কিছুদিন পরে একটা জাহাজের চাকরি নিয়ে আমি বিলেত চলে যাই অর্জুনকাকার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। দেখা হ'ল বিলেত থেকে ফেরবার পর। হঠাৎ সেদিন রাত্রে এসে হাজির। কিন্তু, সকালে উঠে দেখি অর্জুনকাকা নেই। তাঁর উনুনটি বাইরের বারান্দার নীচে ধোঁয়াচ্ছে। চাকরটা বললে, বুড়োবাবু আমার কাছ থেকে কিছু কয়লা আর ঘুঁটে নিয়ে নিজে হাতে উনুনে আঁচ দিয়ে গঙ্গাস্নান করতে গেছেন। এখুনি ফিরবেন। হাতে বিশেষ কোনো কাজ ছিল না, তাঁর অপেক্ষাতেই বসে রইলাম। বিলিতি ডিগ্রী সত্ত্বেও চাকরি পাইনি, প্র্যাকটিসও জমাতে পারিনি। কোটিপতি হবার

আশায় কোলকাতা শহরে গিয়ে বসেছিলাম কিছুকাল। কিছু হয়নি। এখন এই মফঃস্বল শহরে এসে বসেছি। কোটিপতি হবার সম্ভাবনা না থাকলেও গ্রাসাচ্ছাদন জুটবে বলে মনে হচ্ছে। দশটার সময় এক জায়গায় যেতে হবে, তার আগে হাতে কোনো কাজ নেই। অর্জুনকাকার অপেক্ষায় বসে রইলাম। একটু পরেই অর্জুনকাকা শিবস্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে এলেন। শুধু গা, শুধু পা। এক হাতে একঘটি জল, অন্য হাতে ভিজে কাপড়, গামছা।

"অর্জুনকাকা, এত ভোরে কষ্ট করে গঙ্গা নাইতে গেলেন কেন? চাকরটাকে বললেই সে বাথরুম দেখিয়ে দিত—"

"কষ্টটা আর কি। এতেই অভ্যস্ত আমি।"

ভিজে কাপড় গামছা জানালার গরাদেতে বেঁধে শুকুতে দিলেন। তারপর এক হাতে জ্বলন্ত উনুনটা তুলে নিয়ে এলেন বারান্দায়।

"বারান্দায় উনুন রাখতে তোমার আপত্তি নাই তো?"

"না। উনুন দিয়ে কী করবেন?"

"দেখ না"—বলেই জলের ঘটিটা বসিয়ে দিলেন তাতে। তারপর উনুনের ধারে ছোট মোড়াখানা টেনে এনে তার উপর বসে গা হাত পা সেঁকতে লাগলেন।

"তুমিও সরে এসে বস না। সোয়েটারই পরো আর শালই গায়ে দাও, এর কাছে কিছু নয়।"

অর্জুনকাকা হাত গরম ক'রে ক'রে দুই গালে দিতে লাগলেন। দু'পা ফাঁক করে উনুনটাকে দুই পায়ের মাঝখানে রেখে দাঁড়ালেন দু-একবার। চাকর চায়ের ট্রে নিয়ে প্রবেশ করল। অর্জুনকাকার সঙ্গে যে আমার কি সম্পর্ক তা স্ত্রীকে সবিস্তারে বলেছিলাম। ট্রের দিকে এক নজর চেয়েই বুঝলাম, সম্মানিত অতিথির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে সে।

অর্জুনকাকা সবিস্ময়ে বললেন—"এসব কি!"

"একটু চা খান।"

"আমার কথা সব ভুলে গিয়েছ দেখছি।"

"চা তো আপনি খেতেন।"

"চা তো খাবই, ওই তো জল হচ্ছে। চা দুধ চিনি আনতে বল— আমার বাক্সে সব আছে—কিন্তু তোমার এখানে এসেছি, তোমারটাই খাব আজ। শৌখিন পেয়ালায় এক-আধ চুমুক খেয়ে কিছু হবে না আমার—"

"বেশ তো, বেশী করেই খান না।"

"আমি নিজের হাতে করব— নিজে খাব, তোমাকেও খাওয়াব।"

"খাবার-টাবারগুলো?"

"আমি তো সকালে কিছু খাই না, তুমি জান। আগে দই-চিঁড়া খেতাম, এখন তা-ও ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল একবার খাই, শুধু দুপুরে, তা-ও নিরামিষ।"

"এত খাবার কি হবে তাহলে, আপনার জন্যে এনেছে—"

"বেশ, আমিই তোমাদের দিচ্ছি। তুমি খাও, তোমার ছেলেমেয়েদের ডাক। ছেলে-পিলে ক'টি তোমার?"

"একটিও হয়নি এখনও।"

"কেন?"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন অর্জুনকাকা। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক যুক্তি অনুসারে আমি যে জন্ম-নিরোধ ব্যাপারে লিপ্ত আছি, তা আর তাঁকে বলতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

অর্জুনকাকা চাকরটাকে বললেন, "তুমি এসব নিয়ে যাও। মাকে বলো কিছু চা, চিনি আর দুধ পাঠিয়ে দিতে, তোমার বাবুর জন্যে একটা কাপ রেখে যাও খালি।"

চাকর নিয়ে এল সব। অর্জুনকাকা চায়ের পাতা শুঁকে বললেন— "এ চা ভালো নয় তোমার। ঠকিয়েছে তোমাকে।"

একটু লজ্জিত হলাম। সত্যি কথাই বলেছেন অর্জুনকাকা। ঠকায়নি— অর্থাভাবে সস্তা দামের চা-ই ব্যবহার করি। শহরে অধিকাংশ বাড়িতেই পেয়ালারই চাকচিক্য, চা খেলো।

অর্জুনকাকার ঘটির জল ফুটে উঠল। তোরঙ্গ থেকে তিনি কুচকুচে কালো পাথরের বেশ বড় একটি গ্লাস বার করলেন। একটি পিতলের ছাঁকনিও।

া তৈরি করলেন, আমাকে এক কাপ দিলেন, নিজে এক গ্লাস নিলেন। চা খেতে খেতে নিজের কথা বলতে লাগলেন। মূর্খ জামাইদের সঙ্গে বনিবনাও য়নি তাঁর। নাতিও মনের মতো হয়নি। স্ত্রী মারা গেছেন, প্র্যাকটিস করতেও আর ভালো লাগে না। দুনিয়ার কারও সঙ্গেই বনল না। বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই ঠিক করেছেন শেষকালে।

"তোমার প্র্যাকটিস হচ্ছে কেমন?"

"চলে যাচ্ছে।"

"হবে, তোমার ঠিক হবে। আমগাছে আমই ফলবে।"

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

"আচ্ছা, তুমি বস। আমি বাজারটা ঘুরে আসি।"

অর্জুনকাকা চলে গেলেন।

আমিও রোগী দেখতে বেরুলাম।

যখন ফিরলাম তখন বেলা বারোটা। ফিরে দেখি অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় অর্জুনকাকা বসে আছেন।

"খুব অদ্ভুত জিনিস দেখলাম একটা।"

"কি?"

"দেখবে? চল না, কাছেই।"

"বলুন না কি?"

"না দেখলে সে ঠিক বুঝবে না। পাঁচ মিনিটের পথ, চলো না"—

যেতেই হ'ল। অর্জুনকাকা আমাকে নিয়ে গেলেন এক লোহার দোকানে।

"ওই দেখ।"

"কি?"

বিস্ময়কর কিছু দেখতে না-পেয়ে বিস্মিত হচ্ছিলাম।

"লোহার চাদরটা দেখছ না! হাত দিয়ে দেখ কত মোটা"—

কোট-প্যান্ট পরা ছিল, ঝুঁকতে একটু কষ্ট হ'ল, তবু অর্জুনকাকার আগ্রহাতিশয্যে ঝুঁকে লোহার চাদরের ঘনত্ব অনুভব করলাম।

"ভালো নয়?"

"হাঁ, বেশ পুরু মনে হচ্ছে।"

"পুরুই দরকার।"

"কি করবেন এ নিয়ে?"

"উনুন। চমৎকার উনুন হবে এতে! তোমার জন্যও একটা করতে দি, কি বল?"

"দিন।"

উনুনের দরকার ছিল না, কিন্তু অর্জুনকাকাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারলাম না। অর্জুনকাকা সোৎসাহে আরও খানিকটা লোহার চাদর, শিক, আংটা প্রভৃতি কিনে নিজেই সেগুলি কামারের ওখানে বয়ে নিয়ে গেলেন। কুলি করতে দিলেন না। কামারকে বললেন—"আর একটা উনুনও করতে হবে। বেশ ভালো মজবুত ক'রে কোরো, বুঝলে?"

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "বাজারে যে-সব তৈরী তোলা উনুন পাওয়া যায়, সে-সব বড় অ-মজবুত। এ দেখো কি রকম হবে—"

ফিরবার পথে বললেন, "এখানে কাঠও বেশ পাওয়া যায়। কাঁঠাল কাঠের দর করে এসেছি, একটা সিন্দুকও করিয়ে নেব ভাবছি।"

তার পরদিন শুধু কাঠ নয়—ইস্ক্রুপ, কবজা, কাঁটি, লোহার পাত এবং যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক ছুতোর মিস্ত্রিও এসে হাজির হ'ল। অর্জুনকাকা সোৎসাহে সিন্দুক করাতে লেগে গেলেন।

আমাকে বললেন, "সিন্দুকটা এমনভাবে করাব যাতে আমার সব কুলিয়ে যায় ওতে। বিছানা-পত্তর, খাওয়া-দাওয়ার জিনিস, উনুনটা, বাসন দু-একখানা, বই-টই—পাঁচটা পুঁটলি ক'রে আর কি হবে? আমার ক'টা জিনিসই বা আছে! একটু বড় করেই করাব, রাত্রে যাতে ওর উপর শুতেও পারি....কি বল?"

"বেশ তো।"

উঠে-পড়ে লাগলেন তিনি। সকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিস্ত্রিটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি চলত।

"ভালো ক'রে র্যাঁদা দাও না, ওর নাম কি র্যাঁদা দেওয়া! বার্নিশ হবে! ও কি করছ তুমি?"

"একটু ভালো ক'রে খেটেখুটে করো বাবা, মজুরি ছাড়া বখশিশও দেব তোমাকে। ফাঁকি দিও না—"

"হাঁ, ঠিক ক'রে মেপে নাও—থামো থামো, আমি ধরছি—"

"আরে বাবা, কতবার বলব তোমাকে, ভিতরে বড় বড় চারটে খোপ হবে, হাঁ চারটে—"

"হাঁ হাঁ হাঁ, প্যাঁচ কোষো না এখন, দাঁড়াও দেখি—"

এই জাতীয় নানা উক্তি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যেত। অর্জুনকাকা মেতে উঠলেন সিন্দুক নিয়ে। একেবারে শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন। জলের মতো খরচ হতে লাগল। পিতলের বড় বড় ডুমো ডুমো পেরেক কিনে আনলেন সিন্দুকের শোভাবৃদ্ধির জন্য। কোণে কোণে লোহার পাত দিলেন মজবুত করবার জন্য। মিলটন কাপড় কিনে সিন্দুকের ভিতর আস্তর দিলেন। যত খরচই হোক, জিনিসটা মনোমত করতে হবে। জীবনে কোনো জিনিসই মনোমত হয়নি; এটাকে নিখুঁত করতেই হবে—আমার মনে হ'ল এই ধরনের একটা জেদ যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে। অন্তত একটা কাজেও তিনি যে সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছেন, এই সান্ত্বনাটুকু আঁকড়ে তিনি তীর্থবাস করতে চান। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, আগ্রহ যেন সিন্দুকটার উপর প্রয়োগ করছেন তাই।

অর্জুনকাকা বললেন—"এর উপর উঠে লাফাও তুমি—"

"কেন?"

"দেখ, কত মজবুত।"

"মজবুত হয়েছে বইকি।"

"আহা, উঠে দাঁড়াও না তুমি—"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিন্দুকটার উপর উঠে দাঁড়াতে হ'ল।

"পা ঠোকো।"

পা ঠুকলাম দু-একবার।

"খুব মজবুত হয়েছে।"

অর্জুনকাকার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

উনুন এসে গেল। অর্জুনকাকা তোরঙ্গটাও আমাকে উপহার দিলেন।

তোরঙ্গের জিনিসপত্র সিন্দুকে পুরলেন। আরও নানারকম জিনিস কিনে ভরতে লাগলেন সিন্দুকে। গোটা-দুই তালা কিনলেন ভালো দেখে।

ক্রমশ যাবার দিন ঘনিয়ে এল। অর্জুনকাকা প্রথমে যাবেন প্রয়াগ, মাঘ মাসটা সেখানে কাটাবেন, তারপর থাকবেন কাশীতে এসে।

অর্জুনকাকাকে তুলে দিতে স্টেশনে গেলাম। একটা কুলি সিন্দুকটা তুলতে পারল না। দু'জন লাগল।

ট্রেন এল। কুলি দু'জন প্রাণপণে চেষ্টা করলে সিন্দুকটাকে গাড়িতে তুলতে, কিন্তু কিছুতেই ঢুকল না। স্যুটকেস নিয়ে কত লোক উঠল-নামল, কিন্তু সিন্দুক নিয়ে অর্জুনকাকা উঠতে পারলেন না। ট্রেন ছেড়ে গেল।

....অর্জুকাকার দিকে চেয়ে দেখলাম—তাঁর সমস্ত মুখ ভ্রূকুটিকুটিল. ঘন ঘন জিব চিবুচ্ছেন তিনি।

"ডাক্তারবাবু, একটু বিরক্ত করতে এলাম আপনাকে"—

"কি বলুন?"

হৃষ্টপুষ্ট স্টেশন-মাস্টার মহাশয় হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"যদি অভয় দেন তাহলে বলি—"

"বলুন না।"

"সার্টিফিকেট দিতে হবে একখানা।"

"কিসের সার্টিফিকেট?"

"সিক্ সার্টিফিকেট।"

"কার অসুখ?"

"আমার স্ত্রীর।"

"কী হয়েছে?"

মাস্টার মহাশয় হাসিলেন। চর্বিস্ফীত গাল দুইটিতে টোল পড়িল।

"কিছুই হয়নি।"

"তবে?"

"বদলির অর্ডার এসেছে। ঠেলেছে বেগমপুরে। ম্যালেরিয়ার ডিপো সেটি মশাই। খাসা আছি এখানে—সুন্দর জলহাওয়া, মাছ দুধ সস্তা। তাই স্ত্রীর অসুখের ছুতো করে একটা দরখাস্ত করব ভাবছি যে, এখন যেতে পারব না। মাস-দুই কোনো রকমে টালমাটাল করে কাটিয়ে দিতে পারলেই ফাঁড়াটা কেটে যাবে। মাস-দুই পরে আমাদের চাটুজ্জে মশাই জয়েন করবেন। তখন আমার পোয়া-বারো। তিনি ছুটিতে গিয়েই মুশকিল হয়েছে কি না। তাঁর জায়গায় কাজ করছে গোখাদক এক ব্যাটা, কোনো কথাই শুনবে না—"

"চাটুজ্জে মশাইটি কে ?"

"আমাদের হেড অফিসের বড়বাবু। আমার পেটোয়া লোক। তিনি এসে পড়লে আমার ভাবনা নেই।"

"আপনাদের রেলের ডাক্তারের কাছ থেকে নিন না সার্টিফিকেট।"

"তাই তো চিরকাল নিয়েছি মশাই। সম্প্রতি এমন এক ব্যাটা যুধিষ্ঠির এসে জুটেছে যে"—

মাস্টার মহাশয় বাক্যটি সম্পূর্ণ করিলেন না। চক্ষু পাকাইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। মাস্টার মশাই লোকটি ভালো। সেদিন আমার জন্য ট্রেন ডিটেন করাইয়াছিলেন, মাঝে মাঝে মাছ পাঠান। ইঁহাকে সাহায্য করিতে আমার আপত্তি নাই।

"আপনার স্ত্রীর কোনো অসুখ নেই ?"

"কিছু না। বাধকের ব্যথা একটা ছিল, আজকাল কিছু নেই। বরং মুটিয়েছে আরও।"

একটু বিব্রত হইলাম।

বলিলাম—"ডাহা মিথ্যে কথা লিখি কি করে বলুন। লিখে না হয় দিলাম, কিন্তু আপনার হেড আপিস যদি রেলের ডাক্তারের সার্টিফিকেট চায় আর তিনি এসে যদি দেখেন যে আপনার স্ত্রীর কিছু হয়নি, তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখুন—"

"তা বটে। ব্যাটা যুধিষ্ঠির হয়েই মুশকিল হয়েছে কিনা। তাহলে উপায় একটা বাতলান—কি করি"—

হাসিয়া বলিলাম, "বটতলার নিস্তারিণী দেবীর কাছে সিন্নি মানত্ করুন কিছু।"

"করিনি ভেবেছেন ? মাসখানেক আগেই করেছি। কিন্তু কিছু হ'ল না। আজ আবার চিঠি এসেছে। নিস্তারিণী ফেল করাতেই না আপনার কাছে এলাম।"

"আমি কিন্তু কি করি বলুন। লিখে দিতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু সব দিক বাঁচিয়ে লিখতে হবে তো—"

মাস্টার মশাই ক্ষুণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

কয়েকদিন পরে আবার তিনি আসিয়া হাজির।

"উপায় একটা হয়েছে ডাক্তারবাবু। নিস্তারিণী মুখ তুলে চাইলেন বোধ হয়।"

"কী?"

"দরখাস্ত করব ভাবছি, স্ত্রী আমার আসন্নপ্রসবা, এ অবস্থায় তাকে নিয়ে ট্রেনে ট্রাভেল করা বিপজ্জনক। আপনি সেই মর্মে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিন।"

"স্ত্রী সত্যিই আসন্নপ্রসবা না কি?"

"আরে না মশাই। কাল রাত্রে আমার এক শালী এসেছে। পেটের ভারে একেবারে নদপদ করছে। এখন-তখন। রেলের ডাক্তার যদি আসে, তাকেই স্ত্রী বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। কী বলেন—"

মাস্টার মশাই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সার্টিফিকেটখানা লিখিতেছি, এমন সময় মাস্টার মশায়ের বড় ছেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল।

"বাবা, শিগগির চল। মাসীমার ছেলে হয়ে গেছে।"

"অ্যাঁ, বলিস কি!"

"হ্যাঁ, ব্যাটাছেলে। শিগগির এসো তুমি—"

"যাচ্ছি। যা তুই।"

ছেলেটি চলিয়া গেল।

মাস্টার মশাই বলিলেন, "নিস্তারিণীর কাণ্ডটা দেখছেন। প্রথমে পাঁচ পয়সার মেনেছিলাম—গা-ই করল না। পরশু দিন দুর্গা বলে পাঁচ সিকে কবলাতে শালীটা এল—ভাবলাম, যাক টালটা সামলে দিলে বুঝি। আবার কাণ্ড দেখুন—" মাস্টার মশাই চলিয়া গেলেন।

দিন-দুই পরে ভোরবেলায় মাস্টার মশাইয়ের চীৎকারে আমার ঘুম ভাঙিল।

"ডাক্তারবাবু—এবার মশাই নির্ঘাত—"

বাহিরে আসিতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আগস্ট ডিস্টার-বেন্সের ঢেউ এখান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দু'দিকের লাইনই সাফ। পুলটা

পর্যন্ত ভেঙেছে। ছুটি মাস এখন কোথাও নড়বার-চড়বার উপায় নেই। তারপর আমার চাটুজ্জে মশাই এসে যাবেন—"

বলিলাম, "যাক নিশ্চিন্ত হলেন আপনি—"

"কিন্তু নিস্তারিণীর ব্যবহারটা শুনবেন? উইল ইউ বিলিভ, নগদ পাঁচটি টাকা সিন্নি মানতে হয়েছে। এ যে দারোগার বেহদ্দ হয়ে উঠল একেবারে—ছি—ছি—"

তখন সরকারী চাকরি করি। একটি বড় শহরে সদর হাসপাতালের ভার লইয়া আছি, একদিন পাশাপাশি দুইটি কটেজে দুইটি রোগী ভর্তি হইল। রোগী লইয়াই কারবার, বিব্রত হইবার কথা নয়, কিন্তু এ দু'জনকে লইয়া বেশ একটু বিব্রত হইলাম। বিব্রত হইবার প্রধান কারণ রোগীরা নয়, রোগীর পিতারা। একজন ডাক্তার, আমার খুঁত ধরিবার জন্য সর্বদা উদ্যত-মনোযোগ। আর-একজনের পেশা কী তাহা তখনও জানিতাম না। লোকটি নিতান্ত গোবেচারী ভালোমানুষ গোছের। প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক শেষে গীতা-পাঠ করেন। বয়সে আমার অপেক্ষা অনেক বড়, মাথার চুল সব পাকা, কিন্তু আমি গেলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়ান এবং যে দুই-চারিটি প্রশ্ন করেন, সসংকোচে করেন। অতিশয় ভদ্রলোক। ইঁহাকে লইয়া বিব্রত হইবার কারণ ইঁহার অতি-নির্ভরশীলতা। ভদ্রলোক সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়াছেন। আমার সমস্ত নির্দেশ নীরবে বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া যাইতেছেন, কোনোরূপ ব্যস্ততা নাই। অথচ রোগীটি তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং রোগটি টাইফয়েড। দুইটিই টাইফয়েড, ডাক্তারবাবুর পুত্রটির চিকিৎসা ডাক্তারবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়াই করিতেছিলাম, তবু কিন্তু তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছিলাম না। তিনি অতি আধুনিক একখানি বিলাতী গ্রন্থ খুলিয়া তদনুসারে চলিতে চাহিতেছিলেন। মফঃস্বলের হাসপাতালে অত সব বন্দোবস্ত ছিল না। তিনি ক্রমাগতই আফসোস করিতেছিলেন, আহা, কলিকাতায় লইয়া গেলেই হইত। কলিকাতায় না গিয়াও কিন্তু কলিকাতার প্রায় সমস্ত সরঞ্জাম তিনি ডাকযোগে, তারযোগে, রেলযোগে, লোকযোগে যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পত্রযোগে কলিকাতার দুই-চারিজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের উপদেশও আসিয়া পড়িয়াছিল। করিৎকর্মা ভদ্রলোক মফঃস্বলীয় ত্রুটি সংশোধনে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেন নাই।

পাশের কটেজে বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। কোনো অশোভন আড়ম্বর নাই, কোনো অহেতুক ব্যগ্রতা নাই। একাই নীরবে নিপুণহস্তে সেবা করিয়া চলিয়াছেন। যাহা বলিতেছি বিনা মন্তব্যে নিখুঁতভাবে তাহাই করিতেছেন।

ডাক্তারবাবুটির অতি-বৈজ্ঞানিকতা এবং বৃদ্ধটির অতি-নির্ভরশীলতা দুই-ই আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

ডাক্তারবাবুটি আমার পূর্বপরিচিত, নিকটবর্তী একটি শহরে প্র্যাক্টিস করেন। তাঁহার ছেলেটি এখানে হস্টেলে থাকিয়া কলেজে পড়ে। হস্টেলেই জ্বর হইয়াছিল। বাড়াবাড়ি হওয়াতে এবং অন্যত্র লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক মনে হওয়াতে আমারই পরামর্শে তাহাকে হাসপাতালে আনা হইয়াছে। ডাক্তারবাবুও সপরিবারে আসিয়া পড়িয়াছেন। আমাকে দিনে অন্তত দশবার গিয়া রোগী দেখিতে হইতেছে। একটু টেম্পারেচার বাড়িলে, একটু বেশীক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিলে, একটু অস্থির হইলে, একটু কাশিলে ডাকের উপর ডাক আসিতেছে। প্রতিবারই যাইতেছি এবং প্রতিবারই তাঁহার আফসোস শুনিতেছি—আহা, সময়মতো যদি কলকাতা নিয়ে যেতাম। তাঁহার স্ত্রীর আফসোস আরও বেশী। নীলরতন সরকার নাকি তাঁহার সইয়ের মায়ের বকুলফুলের কী একটা হন।

বৃদ্ধটি এ অঞ্চলে আগন্তুক। ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই। প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিলাম, তাঁহার এই পুত্রটির চাকুরিব্যপদেশে তাহাকে লইয়া তিনি এখানে আসিয়া ধর্মশালায় উঠিয়াছিলেন। ছেলেটি সেখানেই জ্বরে পড়ে। জ্বর বাড়াবাড়ি হওয়াতে তাহাকে লইয়া তিনি হাসপাতালে আসিয়াছেন।

উভয়ক্ষেত্রেই টাইফয়েড তাহার অপ্রতিহত প্রতাপে এবং অনিবার্য গতিতে চলিতেছিল।

দুই

একদিন গভীর রাত্রিতে ডাক আসিল।

"শিগগির চলুন একবার, শিগগির।"

ডাক্তারবাবু আলুথালুবেশে নিজেই আসিয়াছেন।

"হেমারেজ শুরু হয়েছে। চলুন, শিগগির—"

প্রায় ছুটিয়াই গেলাম। হেমারেজ নিবারণের সর্বপ্রকার উপায় অনুসৃত হওয়া সত্ত্বেও এই কাণ্ড। দারুণ হেমারেজ।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভিটামিন সি অ্যামপুল আর আছে আপনার? আমার তো আর নেই, কলকাতা থেকে যে ক'টা এসেছিল, সব ফুরিয়ে গেছে।"

আমার ছিল না। বলিলাম।

"কংগো রেড?" (Congo Red)

"না।"

"এখানকার কোনো দোকানে নেই। খোঁজ করে দেখেছিলাম আজ বিকেলে। ভারি ভুল হয়েছে, কলকাতা থেকে আনিয়ে রাখলেই হ'ত।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ,—এমন একটা ব্যাক্‌ওয়ার্ড জায়গা!"

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "একটা মর্ফিন দিলে কেমন হয়?"

"মর্ফিন দিয়েছি, ক্যালসিয়াম দিয়েছি, সিরাম দিয়েছি, স্ট্রিপটিসিন্ দিয়েছি, তারপর আপনার কাছে গেছি…"

আর কিছু করিবার ছিল না। আইসব্যাগ পেটের উপর রাখাই ছিল। নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ডাক্তারবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, "কংগো রেড কোথাও পাওয়া যাবে না এখানে? ডাক্তার ভাদুড়ি তো খুব আপ-টু-ডেট, তাঁর কাছে পাওয়া যাবে না?"

"বলতে পারি না।"

"দেখি চেষ্টা করে।"

তিনি একটা মোটর বাইকও যোগাড় করিয়াছিলেন। একটু পরেই সেটা গর্জন করিয়া উঠিল। ফট-ফট-ফট শব্দে নিশীথ অন্ধকারকে সচকিত করিয়া কংগো রেডের সন্ধানে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

….মৃত্যুকালে পুত্রের সহিত দেখা হইল না।

ছেলেটির মা মাথার শিয়রে বসিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া মৃত্যুপথযাত্রীর কর্ণে একটি আশ্বাসবাক্যও বর্ষিত হইল না! যতক্ষণ বসিয়া ছিলেন কেবল হাহাকার করিতেছিলেন।

"এমন বেঘোরে তোর প্রাণটা যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি রে বাবা··· "

একটু পরেই যে চিরকালের মতো সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তাহার কানের কাছে একটানা এই আর্তনাদ।

তাহার পরদিন যখন তাহারা চলিয়া গেল, আমাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিয়া গেল না। আমিই যেন অপরাধী।

তিন

দিন দুই পরে হাসপাতালের নার্স আসিয়া আমাকে জানাইল যে, কটেজ ওয়ার্ডের দ্বিতীয় টাইফয়েড রোগীটির অবস্থাও ভালো নয়। নাড়ি বৈকালের দিকে আরও খারাপ হইয়াছে—গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়া সত্ত্বেও। সকালে একবার দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সমস্ত দিন আর কোনো খবর পাই নাই। নার্সের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি গেলাম।

গিয়া দেখি ছেলেটির মা আসিয়াছেন। মাথার শিয়রে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছেন। বৃদ্ধ তারস্বরে গীতার পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করিয়া চলিয়াছেন। ছেলেটির শ্বাস উঠিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধ হাসিমুখে বলিলেন, "আসুন ডাক্তারবাবু, আপনি অনেক করেছেন, এইবার শেষকৃত্য করুন। আপনার পায়ের ধুলো ওর মাথায় দিন····আশীর্বাদ করুন ওর সব যন্ত্রণার যেন অবসান হয় এইবার··· সব গ্লানি যেন মুছে যায়···"

আমি অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

"আসুন····"

আমাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, "ইতস্তত করছেন কেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পদধূলিই তো দরকার এ সময়ে। নিন··· জুতো খুলুন·· দিন··· বেশ ভালো করে মাখিয়ে দিন ওর সমস্ত মাথায় ···আসুন—"

তাহার পর স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কাঁদবার সময় অনেক পাবে। এখন নাম শোনাও। ছেলে যাচ্ছে, ওর পাথেয় দিয়ে দাও···"

এতদিন বহু মুমূর্ষু রোগীর গায়ে ছুঁচ ফুটাইয়া বহুরকমে তাহাদের

বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সেদিন কিন্তু আর সে প্রবৃত্তি হইল না। হঠাৎ যেন দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া গেল। বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না। হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিলাম।

পরদিন বৃদ্ধ হাসপাতালে এক হাজার টাকা দান করিয়া চলিয়া গেলেন। চেকটা ভাঙাইতে গিয়া আবিষ্কার করিলাম যে, তিনি একজন বিলাতী ডিগ্রীধারী রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন।

বড়লোকের নেকনজরে পড়িবার জন্য অনেক লোক যেমন ব্যাকুল, অনেক বড়লোকও তেমনি বহু লোককে নিজের নেকনজরাধীন করিবার জন্য ব্যগ্র। কেবল ধন-সম্পত্তি লইয়াই ধনীর তৃপ্তি হয় না। যশ, প্রতিপত্তি, বিশেষত একটি ভক্তের দল না থাকিলে অতুল ঐশ্বর্যও লবণ-বিহীন ব্যঞ্জনের ন্যায় বিস্বাদ ঠেকে। অন্যান্য বিবিধ বিলাস-উপকরণের মতো একদল অনুগ্রহধন্য নর-নারীও বড়লোকদের প্রয়োজন। কিন্তু মনোমত বিলাস-উপকরণ সব সময় জোটে না। বাড়ি, গাড়ি, এমন কি মনোমত ছড়িটাও সব সময় পয়সা ফেলিলেই পাওয়া যায় না। কৃপাক্রীত ভক্ত আরও দুর্লভ। শ্রীযুক্ত জনার্দন সরকার বহুদিন হইতেই সন্ধানে ছিলেন, কিছুতেই মিলিতেছিল না। জীবনে বহু রকম অনুগ্রহ তিনি বহু ব্যক্তিকে নিজে কিম্বা অন্যকে দিয়া করাইয়াছেন, কিন্তু কই, কেহই তো আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকে নাই। সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে। মানে, দুনিয়াটাই বেইমান। এবম্বিধ দিব্যদৃষ্টি লাভ করা সত্ত্বেও জনার্দন সন্ধানে ছিলেন। কিছুই বলা যায় না, দৈবাৎ কত রত্নই তো মিলিয়া যায়। যোগেন বসাক সেদিন আসল মুক্তাই একটা কুড়াইয়া পাইল। নীলাম্বর পোদ্দারের কল্যাণে জনার্দনের আধিভৌতিক কোনো অভাবই নাই। জমিজমা, গাড়ি-বাড়ি, ফলের বাগান, ফুলের বাগান, সমস্ত হইয়াছে। ওই একটি শখই অপূর্ণ আছে এখনও। শ্রদ্ধাগদগদ ভক্ত একটি চাই। না পাইলে জীবনই বিফল। কেউ পোঁছে না। বাঁচিয়া লাভ কি? জনার্দন সন্ধানে ছিলেন।...দৈবাৎ রামধনের নাগাল পাইয়া তিনি পুলকিত হইলেন। ডুমুরহাটিতে কষ্ট করিয়া আসা সার্থক মনে হইল। ডুমুরহাটিতে জনার্দনের পূর্বপুরুষের ভিটা ছিল। শৈশবে একবার মাত্র সেখানে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার সেখানে যাইবার প্রয়োজন এ যাবৎ ঘটে নাই। পূর্ব-পুরুষদের আবাস ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সেখানে স্বরাজ স্থাপন করিয়াছিল ঘেঁটু-কচু প্রভৃতি আদিবাসিগণ। সব শুনিয়াও জনার্দন

ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। করিতে হইল, যখন তাঁহার জ্ঞাতিরা ঘেঁটু-কচু উচ্ছেদ করিয়া ইষ্টকস্তূপ সরাইয়া সেখানে বসবাসের আয়োজন করিল। পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা বেদখল হইবে, এ অন্যায় জনার্দন বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্যই তিনি দুইটা চেঞ্জ এবং পাঁচ ক্রোশ গোরুর গাড়ির ধকল সহ্য করিয়া ডুমুরহাটিতে গিয়া হাজির হইলেন। নানাবিধ অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রামধনকে পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার জ্ঞাতিরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেও মোকর্দমা-অভিজ্ঞ জনার্দন শত্রুর আতিথ্য গ্রহণ করা সমীচীন মনে করিলেন না। অথচ অজ পাড়াগাঁ জায়গা, হোটেল জাতীয় কোনো কিছুই নাই। মাথা গোঁজা যায় কোথায়, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটাই বা হয় কিরূপে? জনার্দন বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। কোথায় ওঠা যায়? স্টেশনটাও কাছে নয়। সহসা তাঁহার পিতৃগুরু ন্যায়রত্নের কথা মনে পড়িয়া গেল। ন্যায়রত্নকে তিনি বাল্যকালে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই একবার দেখাতেই তাঁহার মনে যে চিত্রটি আঁকা হইয়া গিয়াছিল, তাহা আজও মোছে নাই। অধ্যাপক রামভূষণ ন্যায়রত্নের তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ বর্ণ, প্রশস্ত উন্নত ললাট, প্রশান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি, শুচিসৌম্য মুখচ্ছবি বালক জনার্দনের চিত্তে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা এতকাল পরে প্রৌঢ় জনার্দনের চিত্তকেও আশ্বস্ত করিল। তাঁহার সহসা মনে হইল যে, গ্রামের মধ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সন্ধান করিতে গিয়া রামধনের দেখা মিলিল। ন্যায়রত্ন বহুদিন পূর্বেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রামশরণও নাই। বস্তুত, ন্যায়রত্ন-পরিবারে এক রামধন ব্যতীত আর সকলেই গতাসু হইয়াছেন। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী গ্রাম প্রায় উজাড় করিয়াছে।

রামধনেরও দুরবস্থা। শরীর শীর্ণ। পরিধানে ছিন্ন বসন। উপবীতগুচ্ছ এবং একটি সরু টিকি ছাড়া ব্রাহ্মণত্বের আর কোনো চিহ্ন তাহার মধ্যে নাই। অধ্যাপক রামভূষণ ন্যায়রত্নের পৌত্র—নিরক্ষর। সামান্য লেখাপড়া শিখিবার সুযোগও গ্রামে নাই। জমিদার ব্রহ্মোত্তরটুকু গ্রাস করিয়াছেন। বিঘা দুই মাত্র জমি অবশিষ্ট আছে, তাহাতেই রামধনের গ্রাসাচ্ছাদন কোনোরূপে

চলে। কুঁড়েঘরটি জীর্ণ। একটি বুড়ী গাই আছে। রামধন তাহারই সেবা করে। জনার্দন যখন গেলেন, রামধন তখন উঠানে বসিয়া খড় কাটিতেছিল। জনার্দনের আকস্মিক আবির্ভাবে সে বিস্মিত হইল। পরিচয় শুনিয়াও তাহার বিস্ময় ঘুচিল না। জনার্দনের নামই সে কখনও শোনে নাই। জনার্দন তাহার ভগ্নকুটীরে আতিথ্যগ্রহণ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

সসম্ভ্রমে বলিল—বেশ তো, আসুন।

কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়েখানি তাড়াতাড়ি ঘরের দাওয়ায় পাতিয়া দিল।

দুই

জনার্দন ডুমুরহাটিতে দিন দুই ছিলেন।

এই দুই দিনে শুধু ভিটা-উদ্ধার নয়, রামধনকেও তিনি আবিষ্কার করিয়া গেলেন। এতদিন যে সন্ধানে তিনি ছিলেন রামধনের মধ্যে তাহার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি যখন তাহাকে আশ্বাস দিয়া আসিলেন—"দেখি তোমার কী করতে পারি, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র তুমি, তোমার জন্য যথাসাধ্য আমি করব"—তখন তাহার সরল চোখ দুটিতে যে আশাদীপ্ত উৎসুক দৃষ্টি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাতে নিজেও তিনি কম আশ্বস্ত হন নাই। এতদিনের আকাঙ্ক্ষা এইবার পূর্ণ হইবে হয়তো প্রভু নীলাম্বর পোদ্দার তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আর বাকি সকলে করে ঈর্ষা। পা-চাটা, খোশামুদে, সুদখোর, বেহায়া····কত কি কথা লোকের মুখ বন্ধ করা যায় না। এতকাল এইভাবেই চলিয়াছে। এইবার হয়তো ভগবান জনার্দনের জীবনেও একটি ভক্ত জুটাইয়া দিলেন। বেশী নয়, শ-পাঁচেক টাকা খরচ করিলেই রামধনের হৃদয় জয় করা যায়। রামধনের শেষ সম্বল যে দুই বিঘা জমি, তাহাও পিতৃঋণে আবদ্ধ। এই বছরে শো[ধ] না করিলে চৈতন্য চাকলাদার ওটুকু নিঃসন্দেহে গ্রাস করিবে। দলিল তি[নি] স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। পাঁচ শত টাকা দিলে জমিটা উদ্ধার হয়। পাঁচ শত টাকা তিনি যে না দিতে পারেন তাহা নয় কিন্তু হঠকারী লো[ক] তিনি নন। ফট করিয়া কিছু একটা করিয়া বসা তাঁহার স্বভাব নয়। রহি[য়া]

বুঝিয়া মাথা ঘামাইয়া কাজ করিতেই তিনি অভ্যস্ত। করকরে পাঁচ শ টাকা, সোজা তো নয়। জনার্দন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এমন সময় ভগবান আবার দয়া করিলেন। দয়াময়ের দয়ার আর শেষ নাই, জনার্দনের মনে হইল। নীলাম্বরের বৃদ্ধা জননী মাথার শির ছিঁড়িয়া হঠাৎ মারা গেলেন। সুরাহা হইয়া গেল।

নীলাম্বর পোদ্দার নামজাদা লোক। ব্যবসায়ী মহলে তাঁহার যথেষ্ট খাতির। গভর্নমেন্টের ঘরেও তদ্বির চলিতেছে, এবার অনেক টাকার 'ওয়ার বণ্ড' কিনিয়াছেন, শীঘ্রই রায়বাহাদুর হইবেন। কত লক্ষ টাকা যে তাঁহার আছে তাহা অনুমান করিয়া লোকে কূল পায় না। প্রিয় বয়স্য এবং ম্যানেজার জনার্দনের সহিত পরামর্শ করিয়া মহাসমারোহে তিনি মাতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মানীর মান রক্ষা যেন হয় এ ছাড়া জনার্দনেরও আর অন্য চিন্তা রহিল না। বিরাট আয়োজন। সমস্ত ভার জনার্দনের উপর। বহু লোক খাইবে, বহু রাঁধুনী চাই। জনার্দন লোক পাঠাইয়া দেশ হইতে রামধনকে আনাইয়া ফেলিলেন।

দরিদ্র রামধন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। এই ধুমধামের ব্যাপারে জনার্দনবাবু লোক পাঠাইয়া তাহাকে কেন আনাইয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। জনার্দন তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—"রান্নাঘরে ঢুকে রাঁধতে লেগে যাও। ডেলি পাঁচ টাকা করে পাইয়ে দেব তোমাকে।" রামধন অবাক হইয়া গেল। তাহাকে রাঁধুনী হিসাবে ডাকা হইয়াছে! মর্মাহত হইলেও চুপ করিয়া রহিল। সত্যিই তো, রাঁধুনী হওয়া ছাড়া তাহার আর কি যোগ্যতা আছে? নিরক্ষর সে। তবু একটু আমতা-আমতা করিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, "আমি এর আগে কখনও রাঁধুনীগিরি করিনি। আমি কি পারব—"

জনার্দন ধমকাইয়া উঠিলেন—"খুব পারবে, খুব পারবে," পরমুহূর্তেই চকি হাসিয়া কোমলকণ্ঠে বলিলেন—"না পারবার কি আছে ওতে? এক্সপার্ট রাঁধুনী অনেক আসছে কোলকাতা থেকে। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। খুনতি-টুনতি নাড়গে যাও একটু বসে। রান্নাঘরে থাকা নিয়ে কথা। যাও—"

রামধন আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

সমস্ত আয়োজন সুসম্পন্ন করিয়া জনার্দন সসঙ্কোচে নীলাম্বরকে আর-একটি পরামর্শ দিলেন। এতই যখন করা হইয়াছে তখন আর একটু না করিলে অঙ্গহানি হইবে। এই উক্তি নীলাম্বরের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিল।

"বল না, আর কি করতে হবে ?"

জনার্দন মনোভাব বিবৃত করিলেন। খাট-বিছানা আসন-বাসন গাই-বাছুর এ রকম দান রামা-শ্যামা সকলেই করে। নীলাম্বরকে রামা-শ্যামার সহিত এক পর্যায়ভুক্ত করিতে জনার্দন কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন। তাঁহার মনে হয়, লক্ষপতি নীলাম্বরের যেরূপ খ্যাতি, তাহাতে মাতৃশ্রাদ্ধে তাঁহার হাতি দান করা উচিত।

....কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া নীলাম্বর মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। বেশ, হস্তীদানই তিনি করিবেন।

হাতি কেনা হইল।

নীলাম্বর হাসিয়া তখন জনার্দনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"একটি সদ্‌ব্রাহ্মণ যোগাড় কর। ওই পেশাদার ব্যাটাদের দেব না আমি.."

নীলাম্বরের স্বতঃপ্রবৃত্ত এই উক্তিতে জনার্দনের সুবিধাই হইল। যে জন্য এত কাণ্ড, সেই কথাটি পাড়িবার সুযোগ পাইলেন। সত্যই দয়াময় ভগবানের দয়ার আর শেষ নাই।

একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনি নিজে থেকেই যখন কথাটি পাড়লেন, তখন একটি নাম আমি করতে পারি। যদি অভয় দেন, বলি।"

প্রিয় বয়স্য জনার্দনের কথা নীলাম্বর প্রায়ই অগ্রাহ্য করেন না।

"বল না—"

জনার্দন স্মিতমুখে ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

"বলেই ফেল না—"

"ছেলেটি আমার নিজের গাঁয়ের লোক কিনা, তাই মনে হচ্ছে—না থাক—এমনিতেই তো পাঁচ জন পাঁচ কথা বলে—"

নীলাম্বর উদ্দীপ্ত হইলেন।

"পাঁচ জনের কথায় কান দিয়ে কাজ কি? তোমার কথাটাই বল না শুনি—"

নীলাম্বর না শুনিয়া ছাড়িলেন না।

জনার্দনকে রামধনের পরিচয় দিতে হইল। পিতামহের গুণ-গরিমা, বংশের বিশুদ্ধ কৌলীন্য, তাহার বর্তমান দারিদ্র্য প্রভৃতির সুনিপুণ বর্ণনা করিয়া অবশেষে জনার্দন বলিলেন,—এ বেচারীকে যদি দেন, একটা সদ্‌ব্রাহ্মণের বংশ রক্ষা পায়। সব যেতে বসেছে। ভিটেটা পর্যন্ত—"

নীলাম্বর বলিলেন—"দিতে আর বাধা কি? দেবার জন্যেই তো কেনা হয়েছে। কিন্তু হাতি নিয়ে ও সামলাতে পারবে কি, যা অবস্থা বলছ—"

"হাতি বেচতে হবে ওকে। সে-ও এক ঝঞ্ঝাট বটে। খরিদ্দার যোগাড় করা কম হাঙ্গামা নয়। যত দিন যোগাড় না হয় তত দিন হাতির খোরাক জোটাতে হবে। হুজুর যা বলেছেন তা ঠিক, ওর পক্ষে সামলানো কঠিন—"

নীলাম্বরের কথার পিঠে এ ধরনের কথা না বলিয়া উপায় ছিল না, কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াও জনার্দন মনে মনে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। কি জানি মোড় কোন্ দিকে ফিরিয়া যায়। কিন্তু দেখিলেন ছোঁড়ার অদৃষ্ট ভালো এবং দয়াময় ভগবানের সত্যই দয়ার শেষ নাই।

নীলাম্বরের বন্ধু জমিদার মুকুন্দ সিং পাশেই বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাকে যদি বেচে, আমিই কিনতে পারি। আমাদের মাতঙ্গীটা বুড়ী হয়ে গেছে। আমাকে একটা হাতি কিনতেই হবে। সস্তায় দেয় যদি, এটাকেই কিনতে পারি।"

জনার্দন উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

"সস্তায় দেবে বইকি। আপনি পাঁচ শ টাকা দিন। ওর দাম হাজার টাকা। কালই কিনেছি আমরা। পাঁচ শ টাকা পেলেই বর্তে যাবে ও।"

গড়গড়ায় মৃদু টান দিয়া নীলাম্বর বলিলেন, "ব্রাহ্মণকে অতটা ফাঁকি দিও না মুকুন্দ। সাড়ে সাত শ দাও তুমি। ঠকবে না, হাতিটা ভালো।"

মুকুন্দ রাজী হইয়া গেলেন।

জনার্দনের কল্পনা-নেত্রে কৃতজ্ঞতা-সিক্ত ভক্ত রামধনের বিহ্বল মুখচ্ছবিটা ফুটিয়া উঠিল। সাপও মরিল, লাঠিও ভাঙিল না। যাক....এতদিনে বুঝি...।

তিন

"মানে ?"

জনার্দন সরকারের চক্ষু কপালে উঠিয়াছে।

কাঁচুমাচু রামধন আনতনয়নে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

"সোনার বেনের দান আমি নিতে পারব না সরকার মশাই, আমাকে মাপ করবেন। আমি গরিব, আমি মুখ্যু, সবই ঠিক, কিন্তু বংশের নাম আমি ডুবিয়ে দিতে পারব না। আমাদের বংশে কেউ কখনও শূদ্রের দান নেয়নি"....

তাহার ঠোঁট দুটি কাঁপিতে লাগিল।

শালা হারামিকা বাচ্চা···

একটু চটলেই এই তার বুলি, কখনও স্বগত কখনও প্রকাশ্যত। ছোট নিষ্ঠুর চোখ দুটো, মুখময় ছোট বড় কতকগুলো আঁচিল, একটা ছোট আবও আছে ডান দিকের চোয়ালটার নীচে। ভ্রূ নেই বললেই হয়। দাড়ি আছে। কটা, কোঁকড়ানো, অবিন্যস্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা ওলের উপর কটা চুল গজিয়েছে কতকগুলো। তাকে কেউ বোঝে না, সে-ও কাউকে বুঝতে চায় না। তাই উদীয়মান কমিউনিস্ট লেখক কমরেড দুলাল দত্ত যখন গল্প লেখার রসদ সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে তার বাড়ি গিয়ে জিন্না-গান্ধী-সম্পর্কিত আলোচনা ক'রে মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং পাকিস্তান যে কতদূর ন্যায়সঙ্গত তা বিচার ক'রে তার প্রকৃত মনোভাব জানবার চেষ্টা করছিল তখন যদিও সে তার হলদে শ্বা-দন্ত দুটো বার ক'রে "হাঁ বাবু, হাঁ বাবু" ব'লে সায় দিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু মনে মনে সে আওড়াচ্ছিল —"শালা হারামিকা বাচ্চা—"

সে জানে কপালে যে লেবেল সেঁটেই আসুক না কেন, ফরসা কাপড়-জামা-পরা বাবু মাত্রেই শালা হারামিকা বাচ্চা। ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা হারামিকা বাচ্চাও সে অনেক দেখেছে কিন্তু তারা এমন স্বার্থপর ছদ্মবেশী নয়। এই 'বাবু'রাই আসলি হারামজাদ্—

কোট-প্যান্টপরা, আচকান-চাপকান-চড়ানো, খদ্দরধারী, মোল্লা-মৌলভী, ডাক্তার-উকিল, হাকিম-ডেপুটি অনেক দেখেছে রহিম কশাই। তার চক্ষে সব শালাই হারামিকা বাচ্চা। সব শালা····

বিশেষত ওই দুলালবাবুর বাপটা। শালা সুদখোর। চতুর্থপক্ষে বিয়ে করেছে হারামজাদা। তাগদের জন্যে কচি পাঁঠার ঝোল খায় রোজ। ছেলেও হয়েছে একটা। নধরকান্তি শিশুটা পাশের গলিতে এসে খেলা করে যখন

রহিম কশাই চেয়ে চেয়ে দেখে মাঝে মাঝে। জোঁকের বাচ্চা! বড় হয়ে রক্ত চুষবে। তুলালবাবু আবার দরদ দেখাতে এসেছেন আমাদের জন্যে— উড়নি উড়িয়ে পাম্প-শু চড়িয়ে....শালা হারামিকা বাচ্চা.... !

ঘোলাটে চোখতুটোতে হিংস্রদীপ্তি ফুটে ওঠে। নড়ে ওঠে কটা কোঁকড়ানো দাড়িগুলো। ভারী ধারালো ছোরাটা চালাতে থাকে সে সজোরে···প্রকাণ্ড খাসির রাং টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

পুরোহিত যেমন নির্বিকারচিত্তে ফুল তোলে, লেখক যেমন অসঙ্কোচে সাদা কাগজে কালির আঁচড় টানে, রাঁধুনী অবিচলিতচিত্তে যেমন জীবন্ত কইমাছগুলো ভাজে ফুটন্ত তেলে, রহিমও তেমনি ছাগল কুচো করে অকুণ্ঠিত দক্ষতা সহকারে। একটুও বিচলিত হয় না।

একটা খাসি, একটা পাঁঠা, গোটা তুই বক্‌রী প্রত্যহ জবাই করে সে। আধ সের পাঁঠার মাংস তুলালবাবুর বাপকে দিতে হয়। সুদস্বরূপ। কবে পাঁচ শ টাকা ধার নিয়েছিল তা আর শোধই হচ্ছে না। ভিটেমাটি সব বাঁধা আছে। সুদের সুদ তার সুদ···হিসাবের মার-প্যাচে বিভ্রান্ত হয়ে শেষে এই সোজা হিসাবে রাজী হয়েছে সে। রোজ আধ সের কচি-পাঁঠার মাংস। চতুর্থপক্ষের অনুরোধে শালাও রাজী হয়েছে।

কিন্তু এ-ও আর পেরে উঠছে না রহিম। এই তুর্মূল্যের বাজারে রোজ কচি-পাঁঠা জোটানো কি সোজা কথা! এ অঞ্চলে যত কচি-পাঁঠা ছিল সব তো ওই শালার পেটে গেল। রোজ কচি-পাঁঠা পায় কোথা সে? অথচ শালাকে চটানো মুশকিল। এক নম্বর হারামি। হেলথ অফিসারটা পর্যন্ত ওর হাত-ধরা···ওর কথায় ওঠে বসে। একটু ইঙ্গিত পেলেই সর্বনাশ করে দেবে।···সেদিন সমস্ত দিন রোদে ঘুরে ঘুরে রহিম হতাশ হয়ে পড়ল। একটু ভয়ও হ'ল তার। কচি-পাঁঠা কোথাও পাওয়া গেল না। কী হবে কে জানে!

হঠাৎ মাথায় খুন চড়ে গেল তার। চতুর্থপক্ষে বিয়ে করেছে শালা। কচি-পাঁঠার ঝোল খাবে রোজ। হারামির বাচ্চা!

চিবুকের কটা দাড়িগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল।

তার পরদিন বাবুর বাবুর্চি বললে এসে—"কাল তুই যে মাংস দিয়েছিলি

একেবারে ফাস্ট কেলাস। খেয়ে বাবুর দিল তর হয়ে গেছে। চেটেপুটে খেয়েছে সব…"

রহিম নীরব।

কেবল দাড়ির গোটা কয়েক চুল নড়ে উঠল। বাবুর্চি বলতে লাগল—"খোকাটাকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না তাই বাবুর মনে সুখ নেই, তা না হলে তোকে ডেকে বকশিশই দিত হয়তো। পাশের গলিতে খেলছিল—কোথায় যে গেল ছেলেটা। বাবু বলেছে, যে খুঁজে দিতে পারবে তাকে পঁচিশ টাকা বকশিশ দেবে। একটু খোঁজ করিস, বুঝলি·· কি রে, কথা কইচিস না কেন·· "

রহিম পচ্ করে একবার থুতু ফেলে নীরবে মাংস কুচোতে লাগল। তার চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছিল!

ট্রেন চলিতেছে।

কামরার মধ্যে চন্দ্রবাবু একা। আপাত-দৃষ্টিতে দ্বিতীয় লোক না থাকিলেও চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের মনের কথা স্তূপীকৃত। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভঙ্গীতে বিভিন্ন কালিতে বিভিন্ন কাগজে নিবদ্ধ অজস্র লোকের সহস্র প্রকার মনোভাব। নীরব অথচ মুখর। টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে ·· অন্ধকার গভীর রাত্রি····স্বপ্নলোকে বিচরণ করিবার এই তো উপযুক্ত সময়। স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়নে চন্দ্রবাবু এক খিলি পান মুখে ফেলিয়া দিলেন। জরদার কৌটাটি ফতুয়ার পকেট হইতে বাহির করিয়া ঢাকনির উপর বার-দুই তর্জনী-আঘাত করিয়া তাহা খুলিলেন, বেশ খানিকটা জরদা তুলিয়া ঊর্ধ্বমুখে ধীরে ধীরে তাহা ব্যায়ত-আননে নিক্ষেপ করিলেন। জানালা খুলিয়া পিক ফেলিলেন। জানালাটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া দিতে হইল—বেশ জোরে একটা হাওয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নাবিষ্ট চন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিলেন। চন্দ্রবাবু ধীর প্রকৃতির মানুষ। তড়বড় করিয়া এটা উলটাইয়া ওটা ভাঙিয়া ছটফট করিয়া বেড়ানো তাঁহার স্বভাব নয়। যাহা করেন, ধীরে-সুস্থে করেন। পাঁচখানি চিঠি বাছিয়াই রাখিয়াছিলেন। সব চিঠি পড়িবার সময় নাই ···চাকরি করিতে হইবে তো। সময় থাকিলে চন্দ্রবাবু সব না হোক আরও অনেক চিঠি নিশ্চয়ই পড়িতেন। এ সব বিষয়ে তাঁহার কৌতূহলী মন কখনও ক্লান্তি-বোধ করে না। খামের চিঠি খুলিবার বিবিধ কৌশল তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। ইহার জন্য যে সব জিনিসের প্রয়োজন তাহা তাঁহার সঙ্গেই থাকে।

খামগুলি চন্দ্রবাবু একবার নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন। তাহার পর নিবিষ্টচিত্তে শুরু করিলেন।

দুই

চন্দ্রবাবু যুবক নন, স্থবির বৃদ্ধও নন। বস্তুত বাহির হইতে দেখিতে তাঁহাকে মনুষ্যরূপী ঝুনা নারিকেল বলিয়া মনে হয়। প্রৌঢ় ব্যক্তি। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের ঠিক কোন স্থানে অবস্থিত তাহা বলা কঠিন। চাকরির খাতা অনুসারে তাঁহার বয়স আটচল্লিশ— কিন্তু তাহা মিথ্যা কথা। কয় বৎসর যে তিনি কমাইয়াছেন তাহা জানাও শক্ত, কারণ সে খবর যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা কেহ বাঁচিয়া নাই। মুখ দেখিয়াও সঠিক কিছু বলা যায় না। দাড়ি-গোঁফ-জুলফিতে পাক ধরিবামাত্রই তিনি ক্ষুর ও কলপের সাহায্য লইয়াছেন। তৃতীয়পক্ষের তরুণী ভার্যা মাধুরীর নিকট অপ্রতিভ হইবার লোক তিনি নন। কিন্তু বয়স যাহাই হউক, চন্দ্রবাবু রসিক ব্যক্তি। ঝুনা নারিকেলের অন্তরে শাঁস-জল আছে। তাঁহার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে গুলিখোরসুলভ যে প্রাণহীনতা প্রতীয়মান হয় তাহা স্বপ্নালুতারই ছদ্মবেশ। আ-কৈশোর রস-পিপাসু তিনি। ছন্দ মিলাইয়া কবিতা অবশ্য কখনও লেখেন নাই— ওসব তুচ্ছ ব্যাপারে কখনও তৃপ্তি হয় না তাঁহার। কবিতা লিখিয়া কি হইবে? কবিতা করা কিংবা কবিতা অনুভব করা—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জীবনের মধ্যে তাহার রসাস্বাদন করাই তো আসল কথা। তাহা তিনি বহুবার করিয়াছেন। মাসতুতো ভাই তেনা বাঁচিয়া থাকিলে বলিতে পারিত যে, কি আগ্রহভরে এবং কত কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি বাসরঘরে, অথবা নব-দম্পতির শয়ন-কক্ষে কৈশোরকালে আড়ি পাতিতেন। চোরের মতো চুপিচুপি উঠিয়া গিয়া কত বাতায়নতলে যে তিনি কান পাতিয়াছেন, কত ছিদ্রপথে যে চোখ রাখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যৌবনকালেও কবিতা করিয়াছেন অনেক। তাহার ইতিহাস তৎকালীন পরিচিত ডাক্তারেরা এবং তাঁহার বিগত দুই পত্নী জানিতেন। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ভগবান চাকরিটিও জুটাইয়া দিয়াছেন চমৎকার। আর. এম. এস.-এর সর্টার তিনি।

বহু কবিতা অনুভব করিবার সুযোগ মিলিয়াছে এবং মিলিবে।

চিঠির ভিতর কত জিনিসই যে দেখিয়াছেন! কত অদ্ভুত রকম মজা! চিঠির কাগজে প্রকাণ্ড ডিগ্রীওলা লোকের নাম ছাপা—মহা বিদ্বান লোক,

কিন্তু স্ত্রীকে (অবশ্য, স্ত্রী কি না ভগবানই জানেন !) এমন অশ্লীল ভাষায় চিঠি লিখিয়াছেন যে, তাহা উচ্চারণ করা যায় না। পড়িতে কিন্তু বেশ লাগে।

আগে আগে চন্দ্রবাবু মেয়েলী হাতের লেখা দেখিয়া পত্র খুলিতেন—এখনও দুই-একটা খোলেন—কিন্তু এখন চন্দ্রবাবুর অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, মেয়েরা তেমন রসাল চিঠি লিখিতে পারে না। প্রায়ই 'আমি ভালো আছি', 'তুমি কেমন আছ' জাতীয় কথায় ভরতি। বড় জোর 'তোমার জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে—তুমি কবে আসিবে'— আর শেষে সেই এক বাঁধা গৎ 'চিঠির উত্তর দিও। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জেনো'—অজস্র বানান ভুল। 'চুমু নাও' মাঝে মাঝে পাইয়াছেন অবশ্য, কিন্তু অধিকাংশই বাজে। কখনও কোনো রসবতীর দেখা যে পান নাই তাহা অবশ্য সত্য নহে—সেই লোভেই এখনও দুই-একটা মেয়েলী হাতের লেখা খোলেন—কিন্তু কদাচিৎ সে রকম রসিকার দেখা পাওয়া যায়। অধিকাংশই বাজে। কী কী জিনিস কিনিয়া আনিতে হইবে তাহারই লম্বা ফর্দ সেদিন পাইয়াছিলেন একটা। চিঠি নামমাত্র—সবই ফর্দ। স্বামীকে নয়, যেন বাজার সরকারকে পত্র লিখিতেছে ! মেয়েরা মজাদার চিঠি লিখিতে পারে না, ইহাই চন্দ্রবাবুর অভিজ্ঞতা।

খামের উপর পুরুষ-হস্তে মেয়ের ঠিকানা-লেখা দেখিলে চন্দ্রবাবু পুলকিত হইয়া ওঠেন। পুরুষদের লেখা চিঠিতেই বস্তু থাকে। এ বিষয়েও অবশ্য চন্দ্রবাবুকে হতাশ হইতে হইয়াছে—বাংলা ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা তাঁহার জানা নাই। পুরুষের লেখা মেয়েলী নামের চিঠি খুলিয়া হয়তো দেখিলেন হিন্দী কিংবা অন্য কোনো ভাষা। কিংবা হয়তো কোনো পিতা কন্যাকে পত্র লিখিতেছেন কিংবা পুত্র মাতাকে। আর এক জাতীয় বিশেষত্বহীন চিঠিও তিনি মাঝে মাঝে খুলিয়া ফেলেন যাহাতে বোঝাই যায় না যে, লেখকের সহিত উদ্দিষ্টা রমণীটির ঠিক সম্পর্ক কি। কিন্তু এ সব কথা বাদ দিলেও মোটের উপর পুরুষদের লেখা চিঠিতেই চন্দ্রবাবু বেশী মজা পাইয়াছেন। ভালো ভালো চিঠির অংশবিশেষ টুকিয়াও রাখিয়াছেন। পুরুষরা নির্লজ্জ—তাহারাই কলম ছুটাইতে জানে ! তাছাড়া তাহারা

বেপরোয়া। পুরুষদের লেখা চিঠির ভিতরেই তিনি একবার এক শত টাকার নোট একখানা পাইয়াছিলেন। কে যেন লুকাইয়া প্রিয়তমাকে উপহার পাঠাইতেছিল। নোট অবশ্য ওই একবারই পাইয়াছেন কিন্তু ছবি পাইয়াছেন বহু। তাঁহার একটা অ্যালবামই ভরিয়া গিয়াছে। ফরাসী, জার্মানী, ইহুদী, ইংরেজ, জাপানী, বাঙালী, উড়িয়া—কত জাতের কত ঢঙের কী ছবি সব। পুরুষদের লেখা চিঠিতেই যে প্রকৃত রসের সম্ভাবনা এ বিষয়ে চন্দ্রবাবু নিঃসন্দেহ। মেয়েলী হাতের লেখা চিঠিও মাঝে মাঝে তাক লাগাইয়া দেয় অবশ্য। একবার একটা চিঠিতে ঠোঁটের ছাপ ছিল। রসের কথাও থাকে মাঝে মাঝে। তবু পুরুষের লেখা চিঠির দিকেই চন্দ্রবাবুর ঝোঁক বেশী।

তিন

মেয়েলী হাতের লেখা প্রথম চিঠিখানা খুলিয়া চন্দ্রবাবু হতাশ হইলেন। তবু পড়িতেছিলেন।

দিদি,

তোমার রিপ্লাই কার্ড গতকাল পাইলাম। তুমি আমাদের রিপ্লাই কার্ড লেখ ইহা তোমার পক্ষে লজ্জাকর না হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আমাদের লজ্জা হয়। তোমার বোঝা উচিত যে, এখানে এখন সব দিক সামলাইবার মতো লোক এক আমি ছাড়া আর কেহ নাই। বাবা কিছুই দেখেন না। সমস্ত হাঙ্গামা আমাকে একা পোহাইতে হয়। তা ছাড়া আমার চাকরি আছে। এক মুহূর্ত বিশ্রামের সময় পাই না। তবু তোমার চিঠি পাওয়ার দুই দিন আগেই গদাধরকে স্যাকরার কাছে পাঠাইয়াছিলাম। তোমার গহনা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। সাত দিন পূর্বে যখন গিয়াছিলাম তখন মাত্র কানপাশাটা হইয়াছিল। শনিবার আমার নিজে গিয়া পুনরায় দেখিবার কথা ছিল। কিন্তু আমার মোটে অবসর নাই—স্কুলের প্রাইজ লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছি—গার্লস গাইডের সমস্ত ভার আমার উপর। তোমার রসিদটা আমি আজই তালুকদার মহাশয়কে পাঠাইয়া দিতেছি। তুমি তাঁহাকেই চিঠি লিখিয়া গহনা ডেলিভারি লইবার ব্যবস্থা

কর। কানপাশাটা আমি দেখিয়াছি, চমৎকার হইয়াছে। অন্যগুলির কথা বলিতে পারিলাম না। দেখিবার সময় নাই। তোমাকে মিনতি করিতেছি এরকম কড়া কড়া চিঠি লিখিয়া আমার মন খারাপ করিয়া দিও না।

চন্দ্রবাবু চিঠিখানা একবার শুঁকিলেন। মৃদু আতরের গন্ধ আছে একটা। চক্ষু বুজিলেন। কল্পনানেত্রে একটি স্ফুরিতাধরা রুষ্টা তরুণীকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মানস-পটে অনিবার্যভাবে যে ছবিটি বারংবার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল তাহা তাঁহার পরিচিত একটি শিক্ষয়িত্রীর—গলার সাঁকি বাহির করা—শাকচুন্নি-মার্কা শুঁটকো কালো মূর্তি—গলার এবং গালের হাড় উঁচু—খাঁড়ার মতো নাক—

"মরুক গে—"

চন্দ্রবাবু দ্বিতীয় পত্র খুলিলেন।

সাবিত্রীসমানেষু,

তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা যদি একটু বুঝিয়া সমঝিয়া না চল তাহা হইলে এ বাজারে তো আমি গেলাম। চাউলের মন চল্লিশের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে, দাইলও অগ্নিমূল্য, তরিতরকারি কয়লা সমস্তই তদ্রূপ। সোপস্টোন-মিশ্রিত আটার দাম নীলাম্বর বলিল বারো আনা সের। সরিষার তেল দুই টাকা—ঘৃতের দাম জিজ্ঞাসা করিবার সাহসই হয় নাই। অতি সাধারণ কাপড় দশ টাকা জোড়া। তবু মাসের খরচ যথাসাধ্য কিনিয়াছি। সব নগদ দিতে পারিলাম না, নীলাম্বরের দোকানে অনেক ধার রহিয়া গেল। ধার না করিয়া উপায় কি, নবীনকে কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইল। আমি একা আর কত পারি বল। এমন দুঃসময়ে সায়া কি না পরিলেই নয়? হটাস্ করিয়া এক টাকা গজ মার্কিন ধারে কিনিয়া বসিলে! আমাকে তুমি নবাব খাঞ্জা খাঁ মনে কর নাকি! প্রত্যহ জুতার চোটে চাঁদির চটা উঠাইয়া মনিব আমাকে পাঁচ শতও নয়, হাজারও নয়, মাত্র পঁচাত্তরটি টাকা দেয়, এ-কথা তোমাদের কত মনে করাইয়া দিব। আমার হাড়-মাস কালি হইয়া গেল যে। অত দাম দিয়া জরদা কিনিবারই বা কি দরকার! বাড়ির পাশে প্রফুল্লর দোকান হইয়া আমাকে ডুবাইবে দেখিতেছি—

"কি আপদ—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চন্দ্রবাবু পত্রটি খামে পুরিয়া ফেলিলেন। পুরা চার পৃষ্ঠা ধরিয়া ক্ষুদি-ক্ষুদি অক্ষরে কেবল ওই এক কথাই লিখিয়াছে লোকটা।

তৃতীয় পত্রটিও পুরুষের হস্তাক্ষর।

ঠিকানায় নাম নীলিমা বসু। খামের রঙ গোলাপী। এ পত্রটিও চন্দ্রবাবুকে হতাশ করিল। নীলিমা পুরুষের নাম।

নীলিমাবাবু,

আপনি যাইবার সময় দুইটি জিনিস ফেলিয়া গিয়াছেন—হকি স্টিক এবং সিগার কেস। আপনার ইউরিন পরীক্ষার রিপোর্ট আজ আসিল– এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। চার পার্সেণ্ট সুগার আছে—কী সর্বনাশ!"

"কচু খেলে যা—"

বাজে চিঠি পড়িবার সময় নাই চন্দ্রবাবুর।

চতুর্থ পত্রটি খুলিলেন। এটি বেশ মোটা চিঠি। পুরুষের হস্তাক্ষর। খাম খুলিতেই একটি ছবি বাহির হইল। অদ্ভুত ছবি। নানারকম পোস্টকার্ডে নানারকম ছবি তিনি দেখিয়াছেন কিন্তু ঠিক এ রকমটি কখনও আর চোখে পড়ে নাই। বাঃ! মুগ্ধনেত্রে চন্দ্রবাবু চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নিষ্প্রভ চোখের দৃষ্টি সহসা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল। ছবি রাখিয়া রুদ্ধশ্বাসে পত্রটি পড়িতে লাগিলেন। বাঃ বাঃ, চমৎকার! এতক্ষণে শ্রম সার্থক হইল। এই তো চিঠির মতো চিঠি। বাহাদুর বটে ছোকরা। বাৎস্যায়ন, হাভেলক লিস, ফ্রয়েড, কিছু আর বাকি রাখে নাই। কী ভাষা, কী বর্ণনা! ন্দ্রবাবুর নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল—ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। একবার, ইবার, তিনবার তিনি পত্রখানি পড়িলেন। তবু তৃপ্তি হইল না। একবার চ্ছা হইল চিঠিখানি রাখিয়া দেন—কিন্তু তখনই আবার মনে হইল—না, টা অধর্ম হইবে। রাখিবার দরকার কি, ভালো জায়গাটা টুকিয়া লইলেই ইল। এসব জিনিস টুকিতেও সুখ। মাধুরীকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে। ধুরীর সঙ্গে অবশ্য তিন দিনের আগে দেখা হইবে না—কিন্তু তিন দিন রে তো হইবে। ইতিপূর্বে অনেকবার তিনি এই ধরনের চিঠি টুকিয়া

মাধুরীকে শুনাইয়াছেন। সহসা মাধুরীর মুখখানা মনের উপর ফুটিয়া উঠিল। মাধুরীটা কেমন যেন! কিছুতেই যেন খুশী হয় না, কাছে গেলে প্যাঁচার মতো মুখ করিয়া বসিয়া থাকে! অথচ কী সুন্দর মুখখানি, হাসিলে গালে টোল পড়ে—কিন্তু কিছুতেই হাসিবে না। যাই হোক, এই চিঠির খানিকটা মাধুরীকে শুনাইতেই হইবে—দেখি হাসে কি না এবার।

সাগ্রহে টুকিতে লাগিলেন।

টোকা হইয়া গেলে আদ্যোপান্ত পত্রটি আর-একবার পড়িয়া চন্দ্রবাবু সেটি খামে পুরিয়া ফেলিলেন। ছবিটি অবশ্য বাহিরে রহিল।

এইবার পঞ্চম চিঠি।

ঠিকানাটা ইংরাজিতে টাইপ করা। নীল খাম।

এ ধরনের চিঠিতে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত রকম মজা পাওয়া যায়। অনেক স্বামী টাইপ-করা খাম স্ত্রীকে দিয়া আসেন। টাইপিস্ট ছুঁড়িগুলাও তাহাদের প্রেমাস্পদকে মাঝে মাঝে চমৎকার চিঠি লেখে। টাইপ-করা ঠিকানায় অনেক ভালো জিনিস মিলিয়াছে অনেকবার।

চন্দ্রবাবু আর এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখবিবরে প্রেরণ করিয়া অর্ধস্তিমিত-লোচনে ধীরে ধীরে চোয়াল নাড়িতে লাগিলেন। লালারসে মুখ ভরিয়া উঠিল। জানালা খুলিয়া আর একবার পিক ফেলিলেন। বাস্ রে, কী ভীষণ বিদ্যুৎ হানিতেছে! জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। চতুর্থ চিঠিটা যেন নেশার মতো তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কী সাংঘাতিক বর্ণনা! ইহা পড়িলে মাধুরী এবার নিশ্চয়—

পঞ্চম চিঠিটা খুলিলেন।

অনঙ্গ,

তুমি আসবে শুনে খুব সুখী হলাম। তোমারই আশাপথ চেয়ে আছি। আমি আর পারছি না। তুমি আমাকে নিয়ে যাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, যেখানে হোক নিয়ে যাও। তুমি যেখানে যেমনভাবে রাখবে সেইখানেই তেমনিভাবে থাকব আমি। কেবল এ নরক থেকে

উদ্ধার কর আমাকে। তুমি দেরি কোরো না। বুড়োটা কাল সকালে ডিউটিতে বেরুবে—তিন দিন পরেই ফিরবে আবার। আশা করি কাল বিকেলে কিংবা সকালে এসে পড়বে। আমি তৈরি থাকব। আমার অসংখ্য চুম্বন নাও।

ইতি—

তোমারই মাধুরী

প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বাহিরে একটা বজ্র পড়িল।

প্রভাত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রাভাতিক গীতি-বন্দনা সমাপনান্তে আশ্রমিকগণ স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। কেহ পাঠে মগ্ন, কেহ গোচারণে গিয়াছেন, কেহ সমিধ আহরণে ব্যস্ত। আশ্রম-অঙ্গন-প্রান্তে যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী কাত্যায়নী উদূখলে মুষল প্রহারকরত নীবার কণ্ডন করিতেছেন এবং কৌতুকসহকারে লক্ষ্য করিতেছেন অদূরে ইঙ্গুদী-বৃক্ষ-সন্নিহিত গুল্ম-ছায়ায় সাবধান-সঞ্চরণে তিত্তির-দম্পতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অতিশয় চতুর সঙ্গোপনশীল প্রাণী ইহারা, আশ্রম শান্ত না হইলে আত্মপ্রকাশ করে না। এই তিত্তির-দম্পতিকে দেখিলে প্রত্যহই কাত্যায়নীর যে-কাহিনীটি মনে পড়ে অদ্যও তাহা পড়িল। কথিত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যাজ্ঞবল্ক্য তাহাতে পৌরোহিত্য করিতে অস্বীকৃত হইয়া গুরুর নিকট শিক্ষিত বেদ বমন করিয়া দেন এবং সে সমস্তই তিত্তির পক্ষীর রূপ ধরিয়া নাকি বহির্গত হয়। এই তিত্তির-দম্পতিকে দেখিলেই কাত্যায়নী উক্ত অলৌকিক কাহিনীটি স্মরণ করেন। একদা স্বামীকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দেন নাই, মৃদুহাস্য করিয়াছিলেন মাত্র। জ্ঞান-গম্ভীর তপস্বী স্বামীকে প্রগল্ভ প্রশ্ন করিতে কাত্যায়নীর শঙ্কা হয়। বস্তুত, স্ত্রী-প্রজ্ঞা কাত্যায়নী যাজ্ঞবল্ক্য-সমীপে চিরকালই সঙ্কুচিতা, গৃহকর্মের মধ্যে তিনি আজীবন আপনাকে অবলুপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন, মৈত্রেয়ীর মতো তো তাঁহার বাক্‌পটুতা অথবা বিদ্যাবত্তা নাই যে স্বচ্ছন্দে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত দীর্ঘ কথোপকথনে নিরত হইতে পারেন। ভারতপূজ্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তিনি কী আলাপ করিবেন!

সহসা তিনি শুনিতে পাইলেন কুটীর-অভ্যন্তরে ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, "অয়ি, পতির প্রতি প্রীতিবশত পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। অয়ি, জায়ার প্রতি প্রীতিবশত জায়া প্রিয় হয় না,

আত্মপ্রীতির জন্যই জায়া প্রিয় হয়। অয়ি, পুত্রগণের প্রতি প্রীতিবশত পুত্রগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়—"

কাত্যায়নীর ওষ্ঠপ্রান্ত ঈষৎ বক্র হইল। তিনি অনুমান করিলেন, অদ্যও সপত্নী মৈত্রেয়ী স্বামী-সহ ব্রহ্ম-বিষয়ক বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়াছেন। কাত্যায়নীর মনে প্রশ্ন জাগিল, ইহা না করিয়া অরণি-সহযোগে অগ্নি উৎপাদনকরত ভর্তার নিমিত্ত পিষ্টক প্রস্তুত করিলে কি পত্নী-কর্তব্য চারুতর-রূপে নিষ্পন্ন হইত না? কাত্যায়নী বুঝিতে পারেন না মৈত্রেয়ীর মনোভাব কী। মৈত্রেয়ী কোনোদিনই গৃহকর্ম বিষয়ে তাবৎ উৎসাহ প্রকাশ করেন না, গৃহকর্মে সাতিশয় নিপুণাও নহেন, ব্রহ্ম-বিদ্যা-অনুশীলনেই তাঁহার যত কুশলতা। ব্রহ্ম, আত্মা, অমৃত! কাত্যায়নীর ওষ্ঠপ্রান্ত বক্রতর হইল। তিনি অধিকতর শক্তি প্রয়োগকরত উদূখলে মুষল চালনা করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষোভে তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎকাল পরে পুনরায় তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল স্বামী বলিতেছেন, "যেমন বাদ্যমান বীণা হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণাকে গ্রহণ করিলে অথবা বীণাবাদককে গ্রহণ করিলে ঐ শব্দসমূহ গৃহীত হয়, যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে পৃথক পৃথক ধূম নির্গত হয়, তেমনি অয়ি মৈত্রেয়ি, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ—"

ধূম শব্দটি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিবামাত্র কাত্যায়নীর স্মরণ হইল গত সন্ধ্যায় ধূমানাম্নী আশ্রম-ধেনুটি কিঞ্চিৎ অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল, অবিলম্বে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা কর্তব্য, হয়তো অচিরে তাহার শুশ্রূষারও প্রয়োজন হইবে। উদূখল-গাত্রে মুষলটি তির্যগ্‌ভাবে স্থাপনকরত কাত্যায়নী গোশালা অভিমুখে গমন করিলেন।

তথায় গিয়া তাঁহার চিন্তা দূরীভূত হইল, দেখিলেন ধূমা সুস্থ হইয়াছে, তৃণচর্বণে আর অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না। কাত্যায়নীকে দেখিয়া ধূম্রবর্ণা স্নিগ্ধনেত্রা ধূমা হর্ষভরে মৃদু হাম্বারব করিল, কাত্যায়নী তাহার সুচিক্কণ পৃষ্ঠদেশে স্নেহভরে হস্তার্পণকরত তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

অদূরে বৃদ্ধ আশ্রম-মৃগ চিত্রক ভূমিনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া নব-দূর্বাদল-ভোজনে

ব্যাপৃত ছিল, কাত্যায়নীর পদশব্দে সে-ও তাহার শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত-শৃঙ্গ-শোভিত মস্তক তুলিয়া স্নেহ-প্রত্যাশী একাগ্র দৃষ্টিতে কাত্যায়নীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মৃদু হাসিয়া কাত্যায়নী তাহার নিকটেও গেলেন এবং ঈষৎ ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "তোমাকে লইয়া খেলা করিবার মতো সময় এখন আমার নাই, আমার অনেক কাজ।" চিত্রক শৃঙ্গ-শোভিত মস্তকটি একবার সঞ্চালিত করিয়া পুচ্ছটি ঈষৎ আন্দোলিত করিল এবং ভৎর্সিত হইয়া অমনোযোগী বালক যেমন পাঠে মনঃসংযোগ করে তেমনি নব-দূর্বাদলে মনঃসংযোগ করিল।

কাত্যায়নী পুনরায় অঙ্গন-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল হয়তো এতক্ষণ বায়সকুল আসিয়া নীবার ভোজন করিতেছে। এবম্বিধ আশঙ্কা সত্ত্বেও কিন্তু কিছুদূর গিয়া তাঁহাকে থামিতে হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, নবাগত আশ্রম-বালক আরুণির পীতবর্ণ উত্তরীয়টি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে। আরুণি কিছুক্ষণ পূর্বে গোচারণে গিয়াছে। প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে বিধৌত আর্দ্র উত্তরীয় শুষ্ক করিবার মানসে আরুণি প্রত্যহ সেটি আমলকী-শাখায় প্রলম্বিত করিয়া দেয়, কিন্তু গ্রন্থি শিথিল থাকে বলিয়া প্রায়শই তাহা বায়ুতাড়িত হইয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রায় প্রত্যহই কাত্যায়নী আরুণির উত্তরীয়টি ধূলি হইতে উদ্ধার করেন। উত্তরীয় হইতে ধূলি অপসারণ করিতে করিতে তিনি ভ্রূকুঞ্চিতকরত অন্য দিনের মতো আজিও স্থির করিলেন যে, আরুণির ঈদৃশ অনবধানতার জন্য অদ্য তাহাকে ভৎর্সনাই করিতে হইবে। একাধিকবার তিনি এ সঙ্কল্প করিয়াছেন। আরুণিকে এ-বিষয়ে ইতিপূর্বে তিনি সচেতন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কণ্ঠে ভৎর্সনার স্বর এ-যাবৎ ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। দুষ্টমতি এই চঞ্চল বালকটির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভৎর্সনাবাক্য রসনা হইতে নির্গত হইতে চাহে না, পরন্তু স্নেহ-রসে সমস্ত অন্তর আপ্লুত হইয়া যায়। ইহা আশ্চর্যের বিষয় হইলেও সত্য যে, আরুণির ভোজনপটুতা, ক্রীড়া-প্রবণতা, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ-অনিচ্ছা, পাঠে অমনোযোগ প্রভৃতি অসদ্‌গুণাবলীই তাহাকে কাত্যায়নীর নিকট প্রিয়তর করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রবাসী বটুর উপর কিছুতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না।

অঙ্গনে প্রত্যাগত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার আশঙ্কা অমূলক ছিল না, একাধিক বায়স আসিয়া নীবার-অপহরণে রত হইয়াছে। করতালি-শব্দে তিনি তাহাদের বিতাড়িত করিলেন, ইঙ্গুদীবৃক্ষ-তলস্থ তিত্তির-দম্পতিও এই শব্দে সচকিত হইয়া গুল্মান্তরালে আত্মগোপন করিল। কাত্যায়নী উদূখল-সমীপবর্তিনী হইয়া পুনরায় নীবার-সংস্কারে মনোযোগ দিলেন।

পুনরায় তাঁহার শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিল স্বামী আবেগভরে বলিতেছেন, "যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলেই বিলীন হয়, তাহাকে আর পৃথক করিয়া গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু জলের যে-কোনো অংশ হইতে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, তেমনি অয়ি, এই মহাভূত অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানঘন। এই মহান্ আত্মা এই সমুদয় ভূত হইতে উত্থিত হইয়া ইহাতেই আবার বিনাশপ্রাপ্ত হয়।"

এই সকল আধ্যাত্মিক বাক্যাবলী কাত্যায়নীর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিল না। অন্য কিন্তু তাঁহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিল স্বামীর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর। সপত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া এমন আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে স্বামী কী বলিতেছেন। কই, এমন আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে স্বামী তাঁহাকে কোনো-দিন কিছু বলিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না তো।

সহসা মৈত্রেয়ীর প্রতি তাঁহার ঈর্ষা হইল। ক্ষোভ-সহকারে তিনি স্মরণ করিলেন মৈত্রেয়ী কেবল শাস্ত্র-চর্চাই করে, আর কিছু করে না। এই যে বৃহৎ আশ্রমে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে মানী গুণী অতিথিবৃন্দ সততই আগমন করেন, যে আশ্রম পূর্ণ করিয়া বিদ্যার্থীর দল সর্বদাই বিরাজমান, যেখানে যাগ-যজ্ঞ নিত্য মহোৎসব লাগিয়াই আছে, সে-আশ্রমের যাবতীয় পরিশ্রম-সাধ্য কর্মভার তিনি একাই তো এতকাল বহন করিলেন। মৈত্রেয়ী তাঁহার শ্রমভার লাঘবে কতটুকু সাহায্য করিয়াছে? সে তো অহরহ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা লইয়াই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। কাত্যায়নীর স্মরণপথে উদিত হইল কিছুকাল পূর্বে আশ্রমে যখন মন্থ-কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তখনও, মৈত্রেয়ী আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মে নিজেকে নিয়োজিত না করিয়া সমাগত

জনৈক মুনির সহিত ব্রহ্ম-বিষয়ক আলোচনায় সময়ক্ষেপ করিয়াছিল। একা কাত্যায়নীই কয়েকজন আশ্রম-বালকের সহায়তায় উদুম্বর বৃক্ষ হইতে স্রুব, চমস, ইন্ধন, অরণি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে একাই ব্রীহি, যব, তিল, মাস, প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, মসূর, খল্য, খলকুল প্রভৃতি গ্রাম্য শস্য একত্র করিয়া দধি, মধু ও ঘৃত দ্বারা সিক্ত করিতে হইয়াছিল। তিনিই রাত্রি জাগরণ করিয়া সমাগত অতিথিবর্গের জন্য পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী কিছুই করে নাই। তাঁহার আরও মনে পড়িল গত বৎসর ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য আসল বৃষ-মাংস-ভক্ষণেচ্ছু হইয়াছিলেন, তাহারও সমস্ত আয়োজন কাত্যায়নীকেই একা করিতে হইয়াছিল। তিনিই যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া মাংস শূল্য প্রস্তুতকরত স্বামীর সন্তোষবিধান করিয়াছিলেন, মৈত্রেয়ী কিছুই করেন নাই। অথচ স্বামীর আবেগ-কম্পিত যত আলাপ সব মৈত্রেয়ীর সঙ্গে। কাত্যায়নী একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার মনে হইল, না না, ইহা মিথ্যা। মৈত্রেয়ী যতই না কেন ব্রহ্ম-বিষয়ক আলোচনা করুক, স্বামীর নিভৃত অন্তর-দেশে কাত্যায়নীর আসন অবিচলিত আছে।

সহসা কুটীরাভ্যন্তরে আলোচনা বন্ধ হইল। দ্বারপ্রান্তে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দেখা দিলেন। প্রতিভাদীপ্ত প্রশস্ত ললাট, পিঙ্গল জটাভারে বার্ধক্যের রজতচ্ছটা, জ্যোতির্ময় নয়ন-যুগল আনন্দ-সমুজ্জ্বল। কাত্যায়নীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "অয়ি কাত্যায়নি, আমি অদ্য বড় আনন্দলাভ করিয়াছি। মৈত্রেয়ী সত্যই আনন্দদায়িনী, তাহার আগ্রহ-বিশুদ্ধ অমৃত-পিপাসা প্রকৃতই অনন্তমুখিনী, সত্যই ব্রহ্মবাদিনী সে। অয়ি কাত্যায়নি, গৃহস্থাশ্রমে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া আমি জীবনের শেষ-প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এইবার আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব। সেজন্য তোমার ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে আমার সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার মানসে আমি মৈত্রেয়ীকে আজ আহ্বান করিয়াছিলাম। মৈত্রেয়ী কী বলিল, জান? সে বলিল, আমি বিত্ত চাহি না, আমি অমৃতত্ব চাই, সমুদয়ের একায়ন যে আত্মা আমি তাহাকেই উপলব্ধি করিতে চাই। বিত্ত লইয়া আমি কি করিব? অয়ি কাত্যায়নি, আনন্দে, বিস্ময়ে, গর্বে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া

উঠিয়াছে। এতদিন মৈত্রেয়ী আমার প্রিয়া ছিল, আজ সে আমার প্রিয়তমা হইয়াছে—"

আবেগের আতিশয্যে বাক্‌রুদ্ধ হইল, যাজ্ঞবল্ক্য আর কিছু বলিতে পারিলেন না। ব্রীড়াবনতমুখী মৈত্রেয়ী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া এক অপরূপ শোভা বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

ব্রহ্ম-অনভিজ্ঞা কাত্যায়নী পাংশু বিবর্ণমুখে উদূখল-সমীপে বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হোটেলটি বেশ পরিচ্ছন্ন। যে ঘরটিতে আমাকে থাকিতে দিয়াছে সেটিও সুন্দর। দক্ষিণ দিক খোলা, পাখাও আছে। খাওয়াও নিন্দনীয় নয়। যে কয়দিন কলিকাতায় থাকিব এখানেই কাটাইয়া দেওয়া যাইবে। কাহারও বাসায় উঠিয়া সসঙ্কোচে থাকার চেয়ে অনেক ভালো। ভালোই হইয়াছে। হোটেলের চাকর আসিয়া বিছানা করিয়া গেল। বেশ চাকরটি। ছিমছাম। পরিষ্কার ফতুয়া গায়ে, মাথায় ঈষৎ টেরি। চোখ মুখ হইতে বিনীত সম্ভ্রম বিকীর্ণ হইতেছে। বেশ ভালো লাগিল। মন্মথ আমাকে ভলো হোটেলই দেখিয়া দিয়াছে। নালিশ করিবার কিছু নাই। আহারাদি হইয়া গিয়াছিল, শুইয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিয়াও ঘুম আসিল না। মুদিত চোখের সম্মুখে বহুদিন আগেকার বিস্মৃতপ্রায় একটি ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

অনেকদিন আগে একবার একটি ভদ্রলোকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেদিনকার সেই ছবিটি বার বার মনে পড়িতেছে। ভদ্রলোক স্টেশনমাস্টার ছিলেন। স্থানটি গঙ্গার ধারে। স্টেশন খুব বড় নয়, কিন্তু সেখান হইতে প্রচুর মাছ চালান হইত। মাছের ব্যবসায় উপলক্ষেই সেখানে গিয়াছিলাম। সেখানকার জেলেদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় মাছের কারবার খোলার ইচ্ছা ছিল। ব্যবসায়-সম্পর্কিত কাজ শেষ করিয়া পরের ট্রেনে ফিরিয়া আসিবার কথা, কিন্তু কাজ শেষ হইল না, থাকিতে হইল। কোথায় থাকা যায় চিন্তা করিতেছিলাম। জেলেদের বাড়িতে থাকিবার প্রবৃত্তি হইল না। পল্লীগ্রাম—হোটেল, ডাকবাংলা, ধর্মশালা কিছুই নাই। একজন বলিল—মাস্টারমশায়ের ওখানে যান না, সেখানে অবারিতদ্বার। গেলাম। একটু কুণ্ঠার সহিতই গেলাম। মাস্টারমশায়ের সহিত সকালে স্টেশনে আলাপ হইয়াছিল, মাছ চালান দিবার রেট, সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতি জানিতে তাঁহার আপিসে গিয়াছিলাম। পুষ্ট-কান্তি

সদা-হাস্যমুখ ভদ্রলোক। মাথায় ঈষৎ টাক, প্রশান্ত প্রদীপ্ত একজোড়া চোখ, পুরুষোচিত একজোড়া গোঁফ। তখন গ্রীষ্মকাল, আপিসেও খালি গায়ে ছিলেন। একবুক চুল, তাহার উপর ধপধপে সাদা উপবীতগুচ্ছ। টেবিলের উপর একটি টুকটুকে লাল গামছা পাট করা আছে, প্রয়োজনের সময় তাহা দিয়াই হাতমুখ মুছিতেছেন। বাড়িতেও দেখিলাম সেই একই বেশ। আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিলেন।

"আসুন আসুন, আজকের ট্রেনে যাওয়া হ'ল না বুঝি? বসুন, খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হ'ল—ওই জেলে বেটাদের ওখানে তো সুবিধে হওয়ার কথা নয়, তার চেয়ে নিমু হালুয়াই ঢের ভালো। কিছু যদি না করে থাকেন, আমার এখানেই হোক না না-হয়।"

একটু ইতস্তত করিয়া শুরু করিতেছিলাম, "ব্যবস্থা যা হয় একটা হয়ে যাবেই। আপনার এখানে আবার এত রাত্রে"—আমার কথা শেষ করিতে না দিয়া মাস্টারমশায় বলিয়া উঠিলেন, "আরে রাত আর কত হয়েছে, এই তো সবে আটটা। আমার এখানেই হোক—বলে আসি ভেতরে," আমাকে বসাইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিলেন—"গিন্নীকে কেবল একটু খবর দেওয়া যে, আর চারটি চাল বেশি করে নাও। রাবণের চুলো তো জ্বলছেই দিনরাত। রেলের কয়লা, পয়সা তো লাগে না—হা—হা—হা—"

চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া মাস্টারমশায় হাসিয়া উঠিলেন।

"এইবার আপনার পরিচয়টা নেওয়া যাক ভালো করে—চা খাবেন?"

"না, থাক।"

"খানই না এক কাপ, এক কাপ চা খেলে আর কী হয়? কোথা দেশ আপনার?"

"হুগলী জেলায়।"

"বাঃ, আমারও যে হুগলী···"

একটু পরেই চা আসিল। তন্ন তন্ন করিয়া মাস্টারমশায় আমার পরিচয় লইতে লাগিলেন। এমন কি, আমার শ্বশুরবাড়ির জ্ঞাতি-গোষ্ঠির খবর যতটা আমার জানা ছিল তাহা তাঁহাকে বলিতে হইল। হাঁটু দোলাইয়া

"বেশ বেশ" বলিতে বলিতে সাগ্রহে তিনি সব শুনিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন কোনো মনোজ্ঞ কাহিনী শুনিতেছেন। পরে জানিয়াছিলাম, ইহাই তাঁহার স্বভাব। তুচ্ছ উচ্চ যাহাই হোক, মানবমাত্রেই তাঁহার প্রিয়। বহু মানুষের সঙ্গ, বহু মানুষের কাহিনী, বহু মানুষের সুখ-দুঃখ লইয়াই তাঁহার জীবন। তাঁহার নিজের সংসারটি খুব ছোট। একটিমাত্র পুত্র, বিদেশে বোর্ডিংএ থাকিয়া পড়ে। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়া আর কেহ নাই। কিন্তু প্রতিদিন প্রায় কুড়ি-বাইশজন লোক খায়। টালি-ক্লার্কবাবুর বউ বাপের বাড়ি গিয়াছেন, তিনি মাস্টারমশায়ের বাসায় খান। নবাগত টিকিট কালেক্টারটির এখনও বিবাহ হয় নাই, একাই এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে মাস্টার-মশায় আর রান্নার হাঙ্গামা করিতে দেন নাই। গঙ্গার ধারে বায়ুপরিবর্তন মানসে মাস্টারমশায়ের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় কয়েকজন আসিয়াছেন, তাঁহারা নিত্য অতিথি। আমার মতো অনাহূত লোকও প্রায়ই থাকেন দুই-একজন। চাকরির আশায় গ্রামের একটি ছেলেও আসিয়াছেন। স্থানীয় বাঙালীরা মিলিয়া ছোটখাটো থিয়েটার পার্টি করিয়াছেন, তাহাতে যিনি বাঁশি বাজান, তিনি এখানে খান। নানা লোকের নানা পরিচয়, সকলেরই আশ্রয় এখানে। মাস্টারমশায়ের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, গুটি গুটি সকলে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। বংশীবাদক ভদ্রলোক (স্থানীয় একটি মাড়োয়ারীর আড়তে মাস্টারমশায় তাঁহার চাকরি জুটাইয়া দিয়াছেন) প্রথমেই আসিলেন। ক্রমশ তবলা-হারমোনিয়মও বাহির হইল। মাস্টারমশায়ের গান-বাজনার শখ আছে। গায়কেরও অভাব নাই দেখিলাম। টালি-ক্লার্ক, ডাক্তারবাবু, দারোগাবাবুর শালা, বায়ুপরিবর্তনের জন্য যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও জন-দুই—বেশ গাহিতে পারেন। দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল। নিধুবাবু, রবিবাবু, দ্বিজুবাবু, রামপ্রসাদ কেউ বাদ গেলেন না। সব রকমই হইল। রাত্রি এগারোটার মালগাড়ি 'পাস' করিয়া ছোটবাবু আসিলেন। তখন চাকর আসিয়া খবর দিল—খাবার জায়গা হয়েছে। সকলে উঠিয়া ভিতরে গেলাম। এখনও ছবিটা বেশ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। মাস্টারমশায়ের কোয়ার্টারের অপরিসর বারান্দায় আহারের স্থান হইয়াছিল। ছোট বারান্দায় ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিতে হইল। সকলের

ভাগ্যে আসনও জোটে নাই। পাট-করা শতরঞ্জি কম্বল বোরা প্রভৃতি দিয়া মাস্টার-গৃহিণী সমস্যার সমাধান করিয়াছেন দেখিলাম। আহারও অতি সাধারণ গোছের—কলাপাতার উপর গরম ভাত, একটু ঘি, আলুভাতে, ডালভাতে, একটা সাধারণ একটু ডাল, একটু তরকারি, মাছের ঝোল, একটু অম্বল। অতি সাধারণ ভোজ্য, কিন্তু কী পরিতৃপ্তিসহকারেই সেদিন যে খাইয়াছিলাম, আজও ভুলিতে পারি নাই। আহারাদির পর কোথায় শোওয়া যায় তাহাও একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। মাস্টারমশায়ের কোয়ার্টারে স্থানাভাব। আমি ওয়েটিংরুমে রাতটা কাটাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতেই মাস্টারমশাই বলিয়া উঠিলেন—"খবরদার খবরদার, ছারপোকায় খেয়ে ফেলবে, অমন কাজটি করবেন না। দেখুন না এইখানেই হয়ে যাচ্ছে একরকম করে। গোটা-দুই বেঞ্চি আছে—তাই জুড়েই করে দিচ্ছি দেখুন না।" বাইরের বারান্দায় দুইখানি বেঞ্চি জুড়িয়া মাস্টারমশায় নিজে দাঁড়াইয়া আমার বিছানা করাইয়া দিলেন। স্থানে-অস্থানে পেরেক ঠুকিয়া একটা হাওড়ার হাটের শতচ্ছিন্ন মশারিও টাঙানো হইল।

....সেদিন আহার শয্যা কিছুই ভালো ছিল না, কিন্তু এক ঘুমে রাত কাটিয়া গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, সেদিন হইতে মাস্টারমশাই আমার আপনলোক হইয়া গিয়াছিলেন।

....মাস্টারমশায়ের সম্বন্ধে কত কথাই মনে পড়িতেছে। একবার মনে আছে, শীতকালে গিয়াছিলাম। ট্রেনটা খুব ভোরে পৌঁছিল। ট্রেন হইতে নামিয়া দেখি অভূতপূর্ব ব্যাপার। স্টেশন প্ল্যাটফর্মের এক কোণে চায়ের একটা স্টল-গোছের হইয়াছে। অনেকেই চা পান করিতেছেন। পুলকিত চিত্তে আমিও আগাইয়া গেলাম। শীতকালের ভোরে এখানে চা পাইব আশাই করি নাই। চমৎকার চা। চা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাম কত?"

"দাম লাগবে না বাবু।"

"দাম লাগবে না! সে কী!"

"মাস্টারবাবু মোসাফিরদের রোজ মাংনিতে পিলান"—এই অদ্ভুত আধাবাংলা আধাহিন্দীতে যে লোকটা জবাব দিল ভালো করিয়া চাহিয়া

দেখিলাম, সে স্টেশনেরই কুলি একজন। অবাক হইয়া গেলাম। সমস্ত প্যাসেঞ্জারদের মাস্টারমশাই বিনা পয়সায় চা খাওয়াইতেছেন! মাস্টার-মশায়ের সহিত একটু পরে দেখা হইল।

"চায়ের সদাব্রত খুলেছেন, ব্যাপারটা কি?"

দরাজ গলায় মাস্টারমশায় হাসিয়া উঠিলেন।

"আমার সে সামর্থ্য কি আছে ভাই? একজন টি মার্চেণ্ট এক 'কেস' চা এমনই দিয়েছিল। ভাবলাম, একা খাই কেন, পাঁচজন মিলে খাওয়া যাক। গণেশ মাড়োয়ারীকে বলাতে চিনিও পাঠিয়ে দিলে কিছু। ঘরের গায়ের দুধ—দুটো গোরুতে সের-আষ্টেক দিচ্ছে আজকাল। আর রেলের কয়লা, রাবণের চুলো দিনরাত জ্বলছে। জংশন থেকে একটা বড় কেতলি আর কিছু কাপ সসার আনিয়ে নিয়েছি। ঝক্সুর ভোরে ডিউটি—তাকে বললাম, তুইও খা, পাঁচজনকেও খাওয়া। বাস, মিটে গেল—"

আবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মাস্টারমশায়ের উপর জোর-জবরদস্তি করিতে কাহারও বাধিত না। লাইনের সকলের তিনি 'দাদা' ছিলেন। আর-একবারের আর-একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। শীতকালে প্রচুর মাছ চালান হইত, প্রত্যেক জেলেই মাস্টারমশায়কে মৎস্য উপঢৌকন দিত। মাস্টারমশাই নিজের জন্য কিছু রাখিয়া বাকিটা বিতরণ করিতেন। ডাক্তারবাবু, দারোগা, পোস্টমাস্টার প্রভৃতিকে তো দিতেনই, বেশী হইলে পরের স্টেশনের বাবুদেরও পাঠাইয়া দিতেন। একবার মাছ বেশী হয় নাই। চালান কম। পরের স্টেশনে পাঠাইবার মতো প্রচুর মাছ একদিনও জোটে নাই। হঠাৎ একদিন মাস্টার-মশায়ের নামে একটা প্রকাণ্ড পার্শেল আসিয়া হাজির হইল। প্রকাণ্ড একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। আমি তখন সেখানে উপস্থিত। বাক্সটা খুলিতেই দুইটা বিড়াল লাফাইয়া বাহির হইয়া গেল। বাক্সে একখানা চিঠি ছিল। পরের স্টেশনের বাবুরা লিখিতেছেন—"দাদা, বিড়াল দুইটাকে পাঠাইয়া দিলাম। তাহারা অন্তত আপনার পাতের কাঁটা চিবাইয়া বাঁচুক।"

"দেখেছ, দেখেছ, ছোঁড়াগুলোর কাণ্ড দেখেছ—"

মাস্টারমশাইয়ের চক্ষু দুইটি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতেছিল। তখনই বাজার হইতে কিছু মাছ কিনিয়া পরের ট্রেনে পাঠাইয়া দিলেন।

এমনই কত ঘটনা।....

কলিকাতায় নিজের কাজে আসিয়াছিলাম। হাওড়া স্টেশন হইতে সোজা হয়তো বড়বাজারের সেই হোটেলটাতেই উঠিতাম। হাওড়া স্টেশনেই পূর্বপরিচিত একজনের সহিত দেখা হইয়া গেল। তাহারই মুখে শুনিলাম, মন্মথ বিলাত হইতে ফিরিয়াছে, ভালো চাকরি পাইয়াছে, একটা ঠিকানাও আমাকে দিল। অনেকদিন মন্মথকে দেখি নাই, একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল, হাওড়া হইতে সোজা তাহার বাসাতেই গেলাম। বাড়িটা বেশ সুন্দর।—আমি বারান্দায় উঠিতেই একটি বালক ভৃত্য আগাইয়া আসিল।

"কি চান আপনি?"

"মন্মথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। বল—"

বালকটি আমার কথা শেষ করিতে দিল না। ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটি শ্লেট-পেন্সিল আনিয়া বলিল—"আপনার নাম আর কেন দেখা করতে এসেছেন তা এতে লিখে দিন—"

লিখিয়া দিলাম। বালক ভৃত্যটি ড্রইংরুম খুলিয়া দিয়া বলিল, "আপনি বসুন এখানে...."

বসিলাম। সোফা-সেটিতে সাজানো ড্রইংরুমটি বেশ সুন্দর। সুরুচির পরিচয় দিতেছে। প্রায় মিনিট দশেক পরে মন্মথ বাহির হইল। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে চিনিতে পারিতাম না। ঢিলা পায়জামা পরা, বাটারফ্লাই গোঁফ। আশা করিয়াছিলাম প্রণাম করিবে, কিন্তু করিল না। কিন্তু আমাকে দেখিয়া তাহার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"ও, আপনি এসেছেন—"

"অনেকদিন দেখিনি। ভাবলাম—"

"বেশ করেছেন। উঠেছেন কোথায়—"

"কোথাও উঠিনি এখনও। হাওড়া স্টেশনে বেচুলালের সঙ্গে দেখা, সে-ই তোমার খবর আর ঠিকানা দিল। সোজা এখানেই চলে এলাম...."

মন্মথ হাতঘড়িটা একবার দেখিল। তাহার পর বলিল—"আমার বাসায়

আজ মোটে জায়গা নেই। একে ছোট বাসা, তার উপর আমার শালী ভায়রাভাই সবাই এসেছেন। চলুন, আপনার থাকবার জায়গা একটা ঠিক করে ফেলা যাক আগে। বেশী রাত হয়ে গেলে হোটেলেও জায়গা পাওয়া যাবে না। যা লোকের ভিড় আজকাল কলকাতায়—" অতিশয় যুক্তিযুক্ত এ উক্তিতে রাগ করিবার কিছু নাই। কিন্তু আমার কেবলই মনে হইতেছে তাহার সোফা-সেটি সরাইয়া ওই ড্রইংরুমে আমার শুইবার একটু স্থান কি করিয়া দিতে পারিত না?

আপনারা হয়তো বলিবেন, এমন অসঙ্গত প্রত্যাশা আপনি করেন কেন? করিতাম না যদি এই মন্মথ সেই মাস্টারমশায়ের ছেলে না হইত।

———

স্থান বঙ্গদেশ, বৃন্দাবনবাবু বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাঁহার পুত্র নিকুঞ্জবিহারী সাধারণ দৃষ্টিতে নিন্দনীয় পাত্র নয়—বিদ্বান এবং চাকুরিস্থ। তথাপি কালের গতিক এমনই হইয়াছে যে বৃন্দাবনবাবুকে পুত্রের বিবাহের জন্যই চিন্তিত হইয়া পড়িতে হইল। নিকুঞ্জবিহারী অবশ্য কন্যা নয়, বৃন্দাবন বাহিরে ব্যস্ততা দেখাইবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন না, মনে মনে কিন্তু তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলেন। বিবাহের প্রস্তাব যে আসে নাই তাহা নয়, অনেক আসিয়াছিল, কিন্তু নিকুঞ্জকে দেখিবার পর আর কেহ ফিরিয়া আসে নাই। নিকুঞ্জ ট্যারা। সুতরাং পুত্রের বিবাহব্যপদেশে বৃন্দাবন অর্থাগমের যে আশা করিয়াছিলেন তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়া রুষ্ট চিত্তে কালের গতিকেরই নিন্দা করিতে লাগিলেন। এ সম্পর্কে ইহা ছাড়া তাঁহার আর কিছু করিবার ছিল না। পরিস্থিতি এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত শানাই বাজিল; কারণ কালের গতিক পরিবর্তিত হইলেও প্রেমের গতিক পরিবর্তিত হয় নাই। ট্যারা নিকুঞ্জ খাঁদা কাদম্বিনীর প্রেমে পড়িয়া গেল। একেবারে মুখ থুবড়াইয়া পড়িল।....

কাদম্বিনীর পিতা ত্রিলোচন দাঁ ও নিকুঞ্জের পিতা বৃন্দাবন মল্লিক সহকর্মী। একই ব্যাঙ্কে উভয়ে কর্ম করেন। বৃন্দাবন কেসিয়ার, ত্রিলোচন কেরানী। উভয়ের বাসাও কাছাকাছি, ঘরও পালটি। তথাপি কোনো পক্ষই যে ইতিপূর্বে বিবাহের প্রস্তাব করেন নাই তাহার কারণ মৌখিক ভদ্রতা বজায় থাকিলেও মনে মনে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরূপ ছিলেন। ত্রিলোচনের আধুনিক চালচলন বৃন্দাবন পছন্দ করিতেন না, বৃন্দাবনের উচ্চপদ ত্রিলোচনের গাত্রদাহ সৃষ্টি করিত। সুতরাং ত্রিলোচন ট্যারা নিকুঞ্জবিহারীকে জামাইরূপে কল্পনা করিতে পারে নাই, বৃন্দাবনের পক্ষেও কলেজ-গামিনী নাতি-উচ্চ-নাসা কাদম্বিনীকে পুত্রবধূরূপে কল্পনা করা অসম্ভব

ছিল। প্রেমের দেবতা এসব গ্রাহের মধ্যে না আনিয়া তরুণ হৃদয়যুগলকে এক অদৃশ্য বঁড়শিতে গাঁথিয়া মজা দেখিতে লাগিলেন।

পরিস্থিতি পরিবর্তিত ও জটিলতর হইল।

দুই

প্রেম ও অগ্নি বেশীদিন চাপা থাকে না।

নিকুঞ্জবিহারী ও কাদম্বিনীর প্রণয়ও বেশীদিন চাপা রহিল না। প্রকাশ হইয়া পড়িল। একদা ত্রিলোচন-গৃহিণী অগোছাল কন্যার টেবিল গুছাইতে গিয়া তাহার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যে কাগজের টুকরাটি আবিষ্কার করিলেন, তাহা নিকুঞ্জবিহারীলিখিত প্রণয়লিপি। সরল বঙ্গভাষায় লেখা। বুঝিলেন, যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে যখনই উনি মেয়েকে কলেজে পড়িতে দিয়াছিলেন তখনই খাল খনিত হইয়াছিল। এখন কুম্ভীর ঢুকিবেই, জানা কথা। ত্রিলোচন আকাশ হইতে পড়িলেন। গৃহিণীর তাড়নায় এবং বিবেকের তাগিদে অবিলম্বেই কিন্তু তাঁহাকে উঠিতে হইল। একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

তিন

ব্যবস্থা করিতে গিয়া ত্রিলোচন স্বয়ং অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া পড়িলেন। কন্যার মনোভাব দেখিয়া তিনি ঘাবড়াইয়া গেলেন। যতদিন গোপনতার আবরণ ছিল ততদিন সঙ্কোচ ছিল। এখন সহসা-উদ্‌ঘাটিত-আবরণা মুহুর্মুহু-নিক্ষিপ্ত-শাণিত-মাতৃবাক্যবাণ-সম্মুখীনা কাদম্বিনী মরীয়া হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। দেশটা যে বাংলা দেশ, রাশিয়া নয়, কাদম্বিনী কিছুতেই তাহা বুঝিবে না। ট্যারা নিকুঞ্জকে ছাড়া আর কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না তা সে ব্যক্তি আই-সি-এস-ই হোক বা কন্দর্প ই হোক। বড় ভয়ানক কথা। কন্যার অটল প্রবৃত্তিকে টলাইবার চেষ্টা যে বৃথা তাহা ত্রিলোচনকে অবশেষে উপলব্ধি করিতে হইল। অনুনয়-বিনয় তর্জন-গর্জন কিছুই কাজে লাগিল না। এই রাশিয়ান প্রবৃত্তির মুখে অগত্যা তখন তিনি সনাতন বঙ্গীয় মুখোশ পরাইবার প্রয়াস পাইলেন। অর্থাৎ আন্তরিক

বিরূপতা দমন করিয়া দন্তে হাসি ঝুলাইয়া বৃন্দাবনেরই দ্বারস্থ হইলেন। ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

চার

বৃন্দাবন চতুর লোক। কিন্তু অভদ্র নন।

তিনিও দন্তে হাসি ঝুলাইলেন,—"বেশ তো। এ তো আনন্দের কথা, আপনি ঘরের লোক, আপত্তির তো কিছু দেখি না। বেশ, নিকুঞ্জকে দেখি ব'লে,...আজকালকার ছেলে, জানেনই তো..."

আবার হাসিলেন।

"আচ্ছা, আমি তাহলে পরে আসব একদিন—"

ত্রিলোচন চলিয়া গেলে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে বৃন্দাবন কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। ব্যাপারটা প্রণিধান-যোগ্য। ছেলেটা ট্যারা হইয়াই যত গোল করিয়াছে কিনা। ভালো ভালো সম্বন্ধ সব ফিরিয়া গেল। ত্রিলোচনের মেয়েটাও কুরূপা। জুতা খটখটাইয়া কলেজে যায়। দেখিয়াছেন তিনি। খাঁদা নাক, কালো রঙ। নিকুঞ্জ পছন্দ করিবে কি? ট্যারা হইলেও অন্ধ তো নয়। তাহলে মতটা আগে লওয়া যাক। আজকালকার ছেলে, কিছুই বলা যায় না। ভাবিবে হয়তো আমি ট্যারা বলিয়া একটা খাঁদা-বোঁচা ধরিয়া দিয়াছি। মা বাঁচিয়া থাকিলে কি...। বিপত্নীক বৃন্দাবন ঈষৎ বিচলিত হইলেন। পুত্রের প্রণয়-কাহিনী তিনি শোনেন নাই, কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল তাঁহার পক্ষে। সুতরাং একটু ইতস্তত করিয়াই পুত্রের নিকট কথাটা একদিন পাড়িলেন তিনি। উত্তরে যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। আধুনিক উপমা দিতে হইলে বলিতে হয় যেন অ্যাটম বম পড়িল। বৃন্দাবন সাধারণ লোক হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেন, কিন্তু তিনি অসাধারণ ব্যক্তি। মাথা ঠিক রাখিতে পারিলেন। পুত্রকে "আচ্ছা" বলিয়া বিদায় দিয়া টাকে একবার হাত বুলাইলেন। বুঝিলেন, এ বিবাহে মত দিতেই হইবে। দেখা যাক—ফাঁকতালে মোচড় দিয়া ব্যাটার কাছ হইতে যদি কিছু আদায় করিতে পারা যায়। হাজার হোক, আমি ছেলের বাপ। দেখাই যাক।

ত্রিলোচন আসিতেই তিনি বলিলেন, "আসুন। অনেক কষ্টে ছেলেকে রাজী করিয়েছি, কিছুতে রাজী হয় না, বলে কালো মেয়ে—হ্যা হ্যা—। যাক, রাজী হয়েছে। কিন্তু...."

মোচড়টি দিলেন।

পাঁচ

নগদ তিন হাজার টাকা।

বিপদবারণ মধুসূদনকে খানিকক্ষণ স্মরণ করিয়া ত্রিলোচন বুঝিলেন সময় নষ্ট হইতেছে, ইহা অপেক্ষা রামতারণের শরণাপন্ন হইলে বেশী কাজ হইবে। রামতারণ হাজরা অল্প সুদে টাকা ধার দেন। লোকটি পরোপকারী। কিন্তু সেখানে গিয়াও ত্রিলোচনকে হতাশ হইতে হইল। রামতারণ অল্প সুদে টাকা ধার দেন বটে কিন্তু সকলকে দেন না। আদায় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিলে মৃদু হাসিয়া বলেন—"দিতে পারলে খুবই সুখী হতাম, কিন্তু আমার হাতে এখন টাকা নেই—হেঁ হেঁ"—ত্রিলোচনকেও তাহাই বলিলেন। কন্যার পিতা ত্রিলোচন নিজেকে বড়ই বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। কন্যাকে তিনি বৃন্দাবনের দাবির কথা কিছুই বলেন নাই। নিকুঞ্জবিহারীর আন্তরিক বার্তাও তিনি জানিতেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল বিবাহটা তাড়াতাড়ি হইয়া গেলে বাঁচেন তিনি। ভিতরে ব্যাপার যে কতদূর গড়াইয়াছে কে জানে। মেয়ে যখন এরূপ বদ্ধপরিকর তখন গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে নিশ্চয়। কলেজ যাইবার নাম করিয়া মেয়ে যে উচ্ছন্ন যাইতেছিল তাহা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। উফ্! নানারূপ বিভীষিকা ত্রিলোচনের নয়ন হইতে নিদ্রা হরণ করিল। মেয়েকেও তিনি পণ বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না—তাঁহার ভয় হইল যদি আত্মহত্যা করিয়া বসে। টাকার চেষ্টায় ব্যাকুলচিত্তে তিনি নানাস্থানে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

....ঋণ কিন্তু কোথাও মিলিল না।

অবশেষে ত্রিলোচন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তাঁহাদের মনিব, মিস্টার মকরধ্বজ ভার্গবের কাছে গেলেন। নিরতিশয় কৃপণ বলিয়া লোকটার যদিও অখ্যাতি আছে, কিন্তু লোকটা বুদ্ধিমান। হয়তো কোনো বুদ্ধি

বাতলাইতে পারে। ত্রিলোচন তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন এবং বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল ভার্গব হৃদয়বানও। ত্রিলোচনকে তিনি আশ্বাস দিলেন। ইংরেজি ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার মর্ম—তুমি এইখানেই বিবাহ ঠিক কর, কেসিয়ারবাবুকে বল, যে টাকা তিনি দাবি করিয়াছেন তাহা তিনি পাইবেন। কি করিয়া টাকাটা পাওয়া যাইবে নিম্নকণ্ঠে তাহার পরামর্শও তাহাকে দিলেন। ভার্গবের বিচক্ষণতায় ত্রিলোচনকে বিস্মিত ও হৃষ্ট হইতে হইল। কিছুক্ষণ পরে বৃন্দাবনও বিস্মিত ও হৃষ্ট হইলেন। ত্রিলোচন তিন হাজার দিতেই রাজী। একটু দরদস্তুর বা কচলাকচলি করিল না। মত পরিবর্তন করিয়া এ আশাও বৃন্দাবন পোষণ করিলেন যে, হয়তো ত্রিলোচনের সহিত আত্মীয়তা করিয়া ভবিষ্যতে আনন্দও মিলিতে পারে।

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

ছয়

........সম্প্রদান হইয়া গিয়াছে।

অন্যান্য দানসামগ্রীর সহিত পণের নোটগুলি একটি রূপার থালায় গুচ্ছ করিয়া বাঁধা আছে। বৃন্দাবন তখনও সেগুলি তুলিয়া রাখেন নাই।

বরকন্যা বাসরঘরে।

বরযাত্রী কন্যাযাত্রীদের আহার সমাপ্ত হইয়াছে।

বৃন্দাবন মাঝে মাঝে প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিতেছেন। সকলেই আসিয়াছেন কেবল ভার্গব এখনও আসেন নাই। এখনও আসিবার সময় আছে। ওই যে....

সহসা মকরধ্বজ ভার্গবকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল। অতিশয় গম্ভীর মুখ।

"আইয়ে আইয়ে—"

বিকশিত-দশন উচ্ছ্বসিত বৃন্দাবন আগাইয়া গেলেন।

ভার্গবের অধরে কিন্তু প্রত্যাশিত ভদ্রতাসূচক হাসিটি ফুটিল না। বরং ওষ্ঠাধর দৃঢ়নিবদ্ধ হইল।

বৃন্দাবন নিকটে যাইতেই তিনি ইংরেজি ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার

বাংলা মর্ম এই—"আমি এইমাত্র খবর পাইলাম যে ব্যাঙ্ক হইতে তিন হাজার টাকার নোট চুরি গিয়াছে এবং তাহা নাকি আপনার বাড়িতেই আছে। আপনি পণস্বরূপ যে টাকাগুলি পাইয়াছেন সেগুলি কোথায়?"

"ওই যে—"

ভার্গব আগাইয়া গিয়া নোটের গোছা তুলিয়া লইলেন। "এই তো আমাদের ব্যাঙ্কেরই ছাপ মারা নোট!"

"ত্রিলোচনবাবু—"

বৃন্দাবন গর্জন করিতেই ত্রিলোচন আগাইয়া আসিয়া সসঙ্কোচে বলিলেন —"আমিই ব্যাঙ্ক থেকে আজ চুরি করে এনেছি ওগুলো।"

"কি করে?"

ভার্গব ইংরেজিতে পুনরায় বলিলেন—"তাহার বর্ণনা পরে শুনা যাইবে টাকাগুলি যখন পাওয়া গিয়াছে তখন আর পুলিশে খবর দিব না, দিলে অনর্থক একটা হাঙ্গামা হইবে।"

বৃন্দাবনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আপনাকে হয়তো অ্যারেস্ট করবে।"

"আমাকে! কেন?"

"কারণ আপনি কেসিয়ার। যাক, টাকা যখন পাওয়া গেল তখন ওসব ফ্যাসাদের মধ্যে গিয়া লাভ কী?"

ভার্গব হাসিয়া নোটের তাড়া পকেটে পুরিলেন। তাহার পর ত্রিলোচনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দিস্ ইজ শেমফুল। আপনাকে ইহার জন্য জবাব দিহি করিতে হইবে। নট নাউ, টুমরো। চলুন এখন যাওয়া যাক—"

ত্রিলোচন সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া হাত কচলাইতে লাগিলেন।

ডাক্তার বন্ধু কিছু পুঁজ ও রক্ত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময় ডাক্তার বন্ধু নিজেই আসিয়া প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক।

"আমার রিপোর্ট দুটো কখন দেবেন ?"

"বিকেল পাঁচটা ছ'টা নাগাদ।"

"ইনি আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাইছেন। তাই নিয়ে এলাম। আমি আর পরিচয় করিয়ে দেব না, নিজের পরিচয় ইনি নিজেই দেবেন। আমি চলি ; আমার অনেক কাজ বাকি।"

প্রাকটিস্-তুঙ্গারূঢ় ডাক্তার বন্ধু চলিয়া গেলেন। আমি আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ঘুরিয়া বসিলাম। তাঁহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। প্রৌঢ়বয়স্ক বটে কিন্তু অনিন্দ্য-কান্তি। আলাপ করিয়া আরও মুগ্ধ হইতে হইল। এরকম পণ্ডিত লোক সচরাচর দেখা যায় না। সক্রেটিস হইতে শুরু করিয়া স্ট্যালিন পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস কণ্ঠস্থ। ভারতবর্ষেরও বৈদিকযুগ হইতে গান্ধীযুগ পর্যন্ত নখদর্পণে। সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি সর্ববিষয়ে চৌকোস। নানাবিধ আলোচনার পর অবশেষে তিনি ব্রহ্মচর্য বিষয়ক আলোচনা শুরু করিলেন। বলিলেন—"দেখুন, অনেক ভেবে-চিন্তে দেখেছি ব্রহ্মচর্য না হলে কিছু হবার উপায় নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।"

"তাই নাকি ?"

"নিশ্চয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে এ বিষয়ে ঠিক করে কিছুই বলা যায় না। যে অগাধ জলে সাঁতার কেটেছে সে-ই জানে অগাধ জলে সাঁতরাবার কি সুখ।"

সহসা ভদ্রলোকের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা হইল, কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন—এখানে তিনি এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াইতে

আসিয়াছেন। যে কয়দিন থাকেন এখানকার বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বেড়াইবেন।

"কারণ ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করাও একটা মস্ত শিক্ষা, বুঝলেন না?"

আমি কাজ করিতে-করিতেই তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, এখন উঠি। পরে আসব আবার।"

চলিয়া গেলেন। আমি কাজ করিতে লাগিলাম। একটু পরে শশধর পণ্ডিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শশধর আমাকে হতাশ করিয়াছিলেন। লোকটার কদর্য চেহারা; মাথায় টিকি, কপালে চন্দন, ত্রিসন্ধ্যা, সদা-সঙ্কুচিত ভাব, ইংরাজি জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি হইতে আমি ঠিক করিয়াছিলাম যে তাঁহার ঠোঁটের ঘায়ের কারণ—সিফিলিস। পরীক্ষা করিয়া কিন্তু অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছি। রক্তে দোষ নাই। শশধর ফী দিয়া রিপোর্ট লইয়া চলিয়া গেলেন।

আমার কাজ শেষ হইল। ল্যাবরেটরি করিবার উপক্রম করিতেছি, ডাক্তার পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

"আমার রিপোর্ট হ'ল মশাই?"

"হ্যাঁ, হয়ে গেছে। কিন্তু রোগীর নাম তো দিয়ে যাননি—তাই রিপোর্টটা লেখা হয়নি।"

"স্বয়ং রোগীকেই তো দিয়ে গেলাম তখন!"

"কে? ওই ভদ্রলোক! বলেন কি!"

"এতে আর বলার কি আছে! কি পেলেন?"

"সিফিলিস গনোরিয়া পজেটিভ যে!"

"তাই তো প্রত্যাশা করেছিলাম। বিলিতি এডুকেশনের মজাই ওই! এম. এ. ডি. লিট—প্রচণ্ড বিদ্বান!"

ডাক্তার বন্ধু মুচকি হাসিলেন।

আমি পশু চিকিৎসা করি। যে দেশে অসুস্থ মানুষেরই ভালো করিয়া চিকিৎসা হয় না সে দেশে পশু-চিকিৎসা করিয়া কি প্রকারে আমার জীবিকা নির্বাহ হয় এ প্রশ্ন যাঁহাদের মনে জাগিতেছে তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত জানাইতেছি যে, আমি সরকারী পশু-চিকিৎসা-বিভাগে চাকুরি করি। কমিশনার সাহেবের ঘোড়া, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুকুর, পুলিশ সাহেবের গাভী প্রভৃতির স্বাস্থ্য তদারক করিয়া এবং ছ্যাকড়া গাড়ির 'পাস' করিয়া আমার অন্ন সংস্থান হয়। মনুষ্য-চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মতো নির্ভরযোগ্য 'প্র্যাকটিস' আমাদের নাই। এই পরাধীন দরিদ্র দেশে থাকিবার কথাও নয়। তবু মাঝে মাঝে দু'একটা 'কল্' জোটে। সেদিন একটি অপ্রত্যাশিত 'কল্' জুটিল। একটি জরুরী তার পাইলাম—'আমার হস্তী অসুস্থ—অবিলম্বে চলিয়া আসুন।' উল্লসিত হইলাম। মোটা টাকা পাওয়া যাইবে। যেখানে যাইতে হইবে তাহা ট্রেনযোগে সাত-আট ঘণ্টার পথ। এতদূর যাইতে হইবে, হাতির অসুখ....খুব কম করিয়া ধরিলেও দুইশত টাকা ফি পাওয়া যাইবে। বাক্স-প্যাঁটরা বাঁধিয়া সানন্দে বাহির হইয়া পড়িলাম। সামনেই পূজা... ভগবান জুটাইয়া দিয়াছেন।

....সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গন্তব্যস্থানে পৌঁছান গেল। মফঃস্বল জায়গা, ছোট গ্রাম। স্টেশনটিও ছোট। বেশী যাত্রী নাই। সেকেণ্ড ক্লাসে আমিই একমাত্র লোক। স্টাইল জাহির করিবার নিমিত্ত সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট করিয়াছিলাম। যিনি আমাকে স্টেশন হইতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি আগাইয়া হাতল ঘুরাইয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া সসম্ভ্রমে আমাকে প্রশ্ন করিলেন—"আপনিই কি ভেটেরেনারি সার্জন?"

"হ্যাঁ।"

"আসুন, আসুন, আমি আপনাকেই নিতে এসেছি।"

তাড়াতাড়ি আমার সুটকেসটা ভদ্রলোক তুলিয়া লইলেন। গোমস্তার

মতো চেহারা। পায়ে মলিন ক্যাম্বিসের জুতা, গায়েও মলিন জামা-কাপড়, একমুখ খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা গোফদাড়ি, পাঁচ-সাত দিন কামানো হয় নাই। আমি ভাবিলাম যে জমিদারের হাতি ইনি বোধহয় তাঁহারই কর্মচারী।…স্টেশন হইতে বাহির হইলাম। আশা করিতেছিলাম মোটর বা ওই-জাতীয় কিছু একটা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু দেখিলাম সেসব কিছু নাই। ভদ্রলোক সাইকেলে আসিয়াছিলেন। সাইকেলটি স্টেশনের বাহিরের দেওয়ালে ঠেসানো ছিল। তিনি আমার জন্য একটি ছ্যাকড়া গাড়ি ঠিক করিয়া দিয়া সাইকেলে আরোহণ করিলেন। খানিকক্ষণ পরে ছ্যাকড়া গাড়ি একটি বাড়ির সম্মুখে থামিল। গাড়ির জানলা হইতে মুখ বাড়াইলাম। স্বল্পালোকে যে বাড়িটি চোখে পড়িল তাহা কোনো বড়লোকের বাড়ি বলিয়া মনে হইল না। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি। এ বাড়ির মালিকের হাতি পুষিবার কথা নয়। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিব কি না ভাবিতেছিলাম, এমন সময় একটি হ্যারিকেন-লণ্ঠন লইয়া ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। সাইকেলযোগে তিনি আগেই আসিয়াছিলেন। সাগ্রহে আহ্বান করিলেন, "আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু, আসুন—এই ঘরে—হ্যাঁ—"

তাঁহার বাহিরের ঘরটিতে গিয়া বসিলাম।

একটি চৌকি, দড়ির ছেঁড়া খাটিয়া, একটি নড়বড়ে টেবিল, গোটা দুই ক্যালেণ্ডারের ছবি—ইহাই সে ঘরটির সাজসজ্জা। ভদ্রলোক আমার সুটকেসটি ঘরের এক কোণে নামাইয়া আমার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া বলিলেন—"এক মিনিট বসুন, আমি একবার বাড়ির ভিতর থেকে আসি। দেখি, চা হ'ল কি না।"

"আমার রুগী কোথায়?"

"এইখানেই আছে। আমারই হাতি…"

ভদ্রলোক ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বিস্মিত হইলাম। লোকটা রসিকতা করিতেছে না কি!

মিনিটখানেক পরেই তিনি হাতল-ভাঙা 'কাপে' এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

"আগে চা-টা খেয়ে নিন, তারপর রুগী দেখবেন।"

"হয়েছে কী?"

"বিশেষ কিছু নয়, খাওয়া বন্ধ করেছে।"

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "আমার দিক থেকে অবশ্য সুবিধে, হাতির খোরাক যোগাতে হচ্ছে না, কিন্তু গিন্নীও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে, তাই মুশকিলে পড়ে গেছি—"ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"হাতি পুষেছেন কি শখ করে?"

প্রশ্নটা না করিয়া পারিলাম না।

"আরে না মশাই। জুটে গেসল, গরিব গেরস্ত মানুষ, হাতি পোষবার শখ হতে যাবে কেন"—

চায়ের খালি পেয়ালাটা পাশে নামাইয়া রাখিয়া বলিলাম, "কি রকম?"

"সে কি আজকের কথা! আমার কিছু ক্ষেত-খামার আছে বুঝলেন, আপনাদের আশীর্বাদে চাকরি করে খেতে হয় না। বছরদশেক আগে একদিন অনেক রাত্রে মাঠ থেকে ফিরছি হঠাৎ নজরে পড়ল একটা লোক মুখ গুঁজড়ে মাঠের মাঝখানে পড়ে আছেন, ঝুঁকে দেখলাম একেবারে অজ্ঞান। লোকজন ডেকে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে এলাম। সেবা-শুশ্রূষা করতে তাঁর জ্ঞান হ'ল। পরিচয় হতে জানতে পারলাম তিনি একজন কচ্ছি ব্যবসাদার। ঘোড়া ছুটিয়ে মাঠামাঠি আসছিলেন, ঘোড়াটা তাঁকে ফেলে পালিয়েছে। পরদিনই তাঁর লোকজন এসে পড়ল, ঘোড়াটিও পাওয়া গেল। আমাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন তিনি। কয়েকদিন পরে দেখি একটা লোক ছোট্ট একটি হাতির বাচ্চা নিয়ে এসে হাজির—সেই কচ্ছি ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন। তিনি নাকি হাতির ব্যবসা করেন। একটি চিঠিও লিখেছেন—আপনারা আমার প্রাণদান করেছেন, বিনিময়ে আপনাদের কি আর দিতে পারি, সামান্য উপহার পাঠালাম, গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব। হাতির বাচ্চাটি দেখতে চমৎকার—তখন ছোট্ট ছিল—কুট্টু-কুট্টু চোখ, ছোট্ট শুঁড়, খুব ভালো লাগল তখন। গিন্নী তো একেবারে আনন্দে আত্মহারা। বললে—ও আমার গণেশ এসেছে। বলেই এক বাটি

দুধ তার সামনে এগিয়ে দিলে। বাস, সেই থেকেই গণেশ থেকে গেল। আমাদের ছেলেপিলেও হয়নি, ওই গণেশই আমাদের সব....”

ভদ্রলোক চুপ করিলেন। আমি সবিস্ময়ে শুনিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনার এইটুকু বাসায় ওকে রাখেন কোথা?”

“উঠোনের দিকে জায়গা আছে অনেকখানি। তা ছাড়া সব বাড়িটাই তো ওর—দরজা দেখছেন না—সব কেটে কেটে বড় করতে হয়েছে যাতে ও যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে পারে—আমরাই সসঙ্কোচে একধারে বাস করি।”

ভদ্রলোক অকৃত্রিম আনন্দে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

“গণেশের পান থেকে চুন খসবার জো নেই, তাহলেই গিন্নী তুল্‌কালাম করবে। একশ বিঘে জমি আছে মশাই—যা কিছু হয় সব ওরই পেটে যায়—একটা হাতির খোরাক, বুঝছেন না? পুজোর সময় ওর সাজ করিয়ে দিতে হয়—এবার গিন্নী একটা রুপোর ঘণ্টা করিয়ে দিয়েছে···স্যাকরার ধার শোধ করতে পারিনি এখনও.......”

ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হাতি পোষার নানাবিধ অসুবিধার কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করিয়া গৃহিণীর ঘাড়ে তিনি দোষ চাপাইতেছেন বটে কিন্তু গণেশকে লইয়া তিনি যে সত্যই বিব্রত তাহা তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া মনে হইল না।

“খুব পোষ মেনেছে?”

“পোষ মেনেছে মানে! গিন্নী যখন নাইতে যায়, বালতি-গামছা শুঁড়ে করে নিয়ে দোলাতে দোলাতে গণেশ পিছু-পিছু যায়। গরমের দিনে রান্নাঘরে বসে গিন্নী যখন রাঁধে ও শুঁড়ে করে পাখা ধরে হাওয়া করে।”

“রান্নাঘরে ও ঢুকতে পারে?”

“আর মশায়, আমাদের ঘর কি আর মানুষের ঘর আছে; হাতির ঘর হয়ে গেছে। এই বাইরের ঘরটিই যা ছোট। এ ছাড়া আর দুটি ঘর আছে—একটি রান্না ভাঁড়ার আর একটি শোবার—দুটোই বিরাট ‘হল’—মানে ‘হল্‌’ করতে হয়েছে ওর জন্য....বাইরের ঘরের দরজাই দেখুন না·· এই দিক দিয়ে উনি বেড়াতে বেরোন....কেটে বড় করতে হয়েছে।”

“আপনাদের সব কথা বোঝে?”

"সমস্ত। মানুষ একেবারে। মান-অভিমান পর্যন্ত করে। এই যে খাওয়া বন্ধ করেছে আমার বিশ্বাস সেটা অভিমানে।"

"কেন, কিছু হয়েছিল নাকি?"

"বাগান থেকে দু'শ ল্যাংড়া আম এসেছিল মশাই, মালী দিয়ে গিয়েছিল। আমি বাড়ি ছিলাম না, গিন্নীও পাড়ায় কোথা বেরিয়েছিলেন, এসে দেখেন একটি আম নেই। সব গণশা খেয়েছে। তাই গিন্নী একটি চাপড় মেরে বলেছিলেন—রাক্ষস, সব খেয়ে বসে আছ, একটি রাখতে পারনি আমাদের জন্যে। সেই যে ফোঁস করে গুম মেরে বসেছে তারপর থেকে আর জলস্পর্শ করেনি। এরকম মাঝে মাঝে করে ও। একটু বকলে-ঝকলেই খাওয়া বন্ধ করে দেয়…কিন্তু এরকম একটানা ছত্রিশ ঘন্টা খাওয়া বন্ধ আর কখনও করেনি….তাছাড়া অতগুলো আম খেয়েছে তো—ভয় হয়ে গেছে আমাদের "

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল।

"চলুন দেখি গিয়ে।"

ভিতরে গিয়া দেখি একটি বিরাট 'হলে' প্রকাণ্ড শতরঞ্চির উপর গণেশ গুম হইয়া বসিয়া আছে। একটি ক্ষীণকায়া মহিলা তাহার শুঁড়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে খাইবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড একটি 'বাথ-টব' কি একটা জলীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং তাহার পাশে লেবুর খোসার স্তূপ।

"খাও লক্ষ্মী—লেবু দিয়ে কেমন সুন্দর বার্লি করে এনেছি। চেখেই দেখ না একটু—"

গণেশ কুলার মতো কান দুটি নাড়িয়া ফোঁস করিয়া শব্দ করিল।

মহিলা আমার দিকে তাকাইয়া সজলকণ্ঠে বলিলেন, "ওর নিশ্চয় কোনো অসুখ করেছে—ওকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখুন আপনি।"

দেখিলাম। রোগের কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। গণেশ সম্পূর্ণ সুস্থ। ব্যাপারটা অভিমানই।

ফিরিবার সময় কর্তা বলিলেন—"আপনার. দক্ষিণা কত দিতে হবে ডাক্তারবাবু…"

"অপরের কাছে হলে দু'শ টাকা নিতাম কিন্তু আপনার কাছে কিছু নেব না।"

"না না, তা কি হয়, এত কষ্ট করে এসেছেন"—

"না, আমি নেব না—"

কিছুতেই লইতে রাজী হইলাম না। তখন তিনি বারান্দায় গিয়া দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"তাহলে আর টাকার দরকার হবে না পোদ্দার। গয়নাগুলো তুমি ফেরত দিয়ে যাও।"

বুঝিলাম, গণেশ-জননী নিজের গহনা বন্ধক দিয়া আমার 'ফি' সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

চৈত্রমাস। রৌদ্রের তেজ বাড়িতেছে। দ্বিপ্রহরে উত্তরদিকে বারান্দার কোণটা শীতল। ভূরিভোজনান্তে একটি কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া সেই কোণটি আশ্রয় করিয়াছি। হস্তে খবরের কাগজ আছে, তন্দ্রাবিষ্ট-নয়নে মনুষ্যজাতির পাশবিকতার কথা পাঠ করিয়া বর্তমান সভ্যতার ভব্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিতেছি, মনে হইতেছে, আমরা ভারতবাসীরা কোনো কারণেই বোধ হয় এমন নৃশংস বর্বর হইয়া উঠিতে পারিব না, যে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের শোণিতধারায়—। হঠাৎ কাগজটা হাত হইতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ঢুল ধরিয়াছিল। উঠিয়া বসিতেই নজর পড়িল, সম্মুখের তপ্ত পথ দিয়া জীর্ণ মলিন বসন পরিহিত একজন পথিক একলা প্রকাণ্ড বস্তা মাথায় করিয়া পথ অতিবাহন করিতেছে। দুঃখ হইল। এই দারুণ রৌদ্র, মাথায় অত বড় বস্তা। নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। লোকটি আমার বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া আর পারিল না, বস্তাটা মাথা হইতে নামাইয়া রাখিয়া হাঁপাইতে লাগিল। অদ্ভুত চেহারা! মাথায় রুক্ষ চুল, মুখময় কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি, চোখে নিকেলের চশমা, মাথায় পাগড়ি, জামা নাই, খালি পা।

হঠাৎ একি! খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলাম। শেষটা উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। বস্তাটা নড়িতেছে। বেশ নড়িতেছে। গেট খুলিয়া বাহির হইয়া গেলাম। কাছে গিয়াও দেখিলাম, সত্যই নড়িতেছে। বস্তার মুখ কষিয়া বাঁধা, ভিতরে কি আছে দেখা যায় না।

কি আছে ওর ভিতর?

কুকুরবাচ্চা।

কুকুরবাচ্চা?

হ্যাঁ। কুড়িটা কুকুরবাচ্চা।

বেশ নির্বিকারভাবে উত্তর দিল।

বস্তায় কুকুরবাচ্চা পুরেছ কেন ?

রাত্রে ঘুমুতে দেয় না, বড় বিরক্ত করে। গঙ্গায় ফেলে দিতে যাচ্ছি।

বল কি ?

বস্তাটা আর একবার নড়িয়া উঠিল।

পাগল নাকি তুমি ? খুলে দাও।

বড্ড বিরক্ত করে বাবু।

দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে যে এই গরমে। খুলে দাও শিগগির।

নিজেই হেঁট হইয়া বস্তার মুখটা খুলিতে লাগিলাম। লোকটা বাধা দিল না। কোমরে হাত দিয়া ঘাড়টা একটু কাত্ করিয়া স্মিতমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। রাস্তায় লোক জমিয়া গেল। দুই-একজন বলিল, লোকটা সত্যিই পাগল। ভিন্ন গ্রামে থাকে।

দুই

কাঁই কাঁই কাঁই কাঁই—কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ—

কুড়িটা কুকুরশাবকের আর্তকণ্ঠ অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিতেছে। প্রত্যেক শাবকটিই সবেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সজোরে ভূমিতে নিপতিত হইতেছে। নিপতিত করিতেছি আমিই। শুইতে গিয়া দেখি, কুড়িটাই আমার বিছানায় কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। কী আপদ !

শত্রুপক্ষের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, রায় মহাশয় অদ্ভুত বেশে সজ্জিত হইয়া সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন। গায়ে টকটকে লাল বনাতের কোট, মাথায় ধপধপে সাদা রেশমের পাগড়ি, অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সাক্ষী দিতেছেন। তিন বৎসর আত্মগোপন করিবার পর আজ এই প্রথম তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাতটি ফৌজদারী মকদ্দমায় তিনি আসামী—সাতটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তাঁহার নামে জারি হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাবধি তিনি অধৃত। আজ এই প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার আবির্ভাবের গুরুতর হেতু আছে। স্বয়ং আসিয়া সাক্ষী না দিলে একটি প্রকাণ্ড মকদ্দমায় তিনি পরাজিত হইবেন, তাঁহার সম্পত্তির অর্ধেক বেহাত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে।

শত্রুপক্ষের লোকেরা পুলিশ সমভিব্যাহারে আদালতের বারান্দায় সাগ্রহে অপেক্ষমান, সাক্ষী দিয়া বাহির হইলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। ঠিক বারান্দার নিচেই একটি তেজস্বী অশ্ব গ্রীবা বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রতি মুহূর্তেই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। রায় মহাশয়ের ঘোড়া। পুলিশ সাহেবের ঘোড়াও অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

রায় মহাশয় সাক্ষী দিয়া বারান্দায় বাহির হইলেন এবং নিমেষের মধ্যে বারান্দার উপর হইতেই একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া গেল।

পুলিশ প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িল, তাহার পর একজন দারোগা পুলিশ সাহেবের ঘোড়াটা লইয়া আসামীর অনুসরণ করিলেন। রায় মহাশয় আগাইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু কিছুদূর গিয়াই লাল বনাতের কোট গায়ে, মাথায় সাদা পাগড়ী অশ্বারোহীকে দেখিতে পাওয়া গেল। অশ্ব তীরবেগে ছুটিতেছে। দারোগাও ঘোড়ার গতিবেগ বাড়াইলেন। বন্ধুর মসৃণ ছোট বড় বহুবিধ প্রান্তর পার হইয়া রায় মহাশয়ের অশ্ব অবশেষে একটা বনের

মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে দারোগার অশ্বও প্রবেশ করিল। বন অতিক্রম করিয়া আবার একটা মাঠ। মাঠে পড়িয়া দারোগা রায় মহাশয়কে পুনরায় দেখিতে পাইলেন—উদ্দাম বেগে ঘোড়া ছুটিতেছে। তিনিও ঘোড়াকে সজোরে কয়েকবার কশাঘাত করিলেন। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর দারোগার মনে হইল, বিধি প্রসন্ন হইয়াছেন। রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি খুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা ঠিক করিবার জন্য তাঁহাকে নামিতে হইয়াছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দারোগা অকুস্থলে আসিয়া পৌঁছিলেন; রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি তখনও ভাল করিয়া বাঁধা হয় নাই।

দারোগা ঘোড়া হইতে নামিয়া গ্রেপ্তার করিতে গিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। রায় মহাশয় নয়! দারোগার বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষু দেখিয়া অপরিচিত লোকটা নীরবে দন্তপঙ্‌ক্তি বিকশিত করিয়া হাসিল।

বনের মধ্যে অশ্বারোহী বদল হইয়া গিয়াছে।

উন্নতমস্তক রাঘব সরকার দ্বিপ্রহরের নিদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে খদ্দর, মাথায় ছাতা নাই। পায়ে জুতা অবশ্য আছে, কিন্তু তাহা এমন কণ্টকসঙ্কুল যে, বিক্ষত পদদ্বয়কে শর-শয্যাশায়ী ভীষ্মের মর্যাদা দিলে খুব বেশি অন্যায় হয় না। উন্নতমস্তক রাঘব সরকারের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি দ্রুতপদেই চলিয়াছেন। সুনির্দিষ্ট নীতি-অনুসরণকারী, অনমনীয়-চরিত্র রাঘব সরকার চিরকালই উন্নতমস্তক। তিনি কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না। স্বকীয় মস্তক সর্বদা উন্নত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া এক রিক্‌শাওয়ালা তাঁহার পিছু লইল।

রিক্‌শা চাই বাবু—রিক্‌শা—

রাঘব একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন। অস্থিচর্মসার লোকটা তাঁহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। যাহারা নিতান্ত অমানুষ, তাহারাই মানুষের কাঁধে চড়িয়া যায় -ইহাই রাঘবের ধারণা। তিনি জীবনে কখনও পালকি অথবা রিক্‌শা চড়েন নাই, চড়া অন্যায় মনে করেন। খদ্দরী আস্তিন দিয়া কপালের ঘামটা মুছিয়া বলিলেন, না, চাই না।

দ্রুতপদে হাঁটিতে লাগিলেন।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া রিক্‌শাওয়ালাটাও পিছু পিছু আসিতে লাগিল। সহসা রাঘব সরকারের মনে হইল, বেচারার ইহাই হয়তো অন্ন-সংস্থানের একমাত্র উপায়। রাঘব কৃতবিদ্য ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কে ধনিকবাদ, দরিদ্র-নারায়ণ, বল্‌শেভিজ্‌ম, ডিভিশন অব লেবার, পল্লীর দুর্দশা, ফ্যাক্টরি, জমিদারি অনেক কিছুই নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল। তিনি আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। আহা, সত্যই লোকটা জীর্ণশীর্ণ অনাহার-ক্লিষ্ট। হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল।

ঘণ্টা বাজাইয়া রিক্‌শাওয়ালা আবার বলিল, চলুন না বাবু, পৌঁছে দিই—কোথায় যাবেন?

ওই শিবতলা পর্যন্ত যেতে ক' পয়সা নিবি?

ছ' পয়সা।

আচ্ছা, আয়।

রাঘব সরকার চলিতে লাগিলেন।

আসুন বাবু, চড়ুন।

তুই আয় না।

রাঘব সরকার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন।

রিক্‌শাওয়ালাও পিছু-পিছু ছুটিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে কেবল নিম্নলিখিতরূপ বাক্য-বিনিময় হইতেছে।

আসুন বাবু, চড়ুন।

আয় না।

শিবতলায় পৌঁছিয়া রাঘব সরকার পকেট হইতে ছয়টি পয়সা বাহি করিয়া বলিলেন, এই নে।

আপনি চড়লেন কই?

আমি রিক্‌শা চড়ি না।

কেন?

রিক্‌শা চড়া পাপ।

ও। তা আগে বললেই পারতেন—

লোকটার চোখেমুখে একটা নীরব অবজ্ঞা মূর্ত হইয়া উঠিল। সে ঘা মুছিয়া আবার চলিতে শুরু করিল।

পয়সাটা নিয়ে যা।

আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে সে পথের বাঁকে অদৃ হইয়া গেল।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত ইতিহাস অবগত হইয়াছি। সংক্ষেপে তাহা এই। গল্পাকারে বলিতেছি।

একদা জনৈক সর্বহারা নিষাদ ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে করিতে তমসা-তীরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। এই নিষাদ এখন যদিও সর্বহারা, কিন্তু একদিন তাঁহার সব ছিল। বহু পত্নী, বহু গাভী, বহু বৃষ, বহু মেট্, বহু কুক্কুর, বহু আরণ্য-সম্পত্তি, কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। বস্তুত ইনিই একদা তরক্ষুরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি সর্বহারা—ধনুর্বাণ ছাড়া আর কিছুই নাই।

সহসা মনে হইতে পারে যে, অত্যাচারী আর্যগণ কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াই বুঝি ইনি দুর্দশা-সাগরে নিপতিত হইয়াছেন। তৎকালে আর্যগণ অনার্যগণকে লাঞ্ছিত করিয়া গর্ব-বোধ করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই নিষাদ ভদ্রলোকের সহিত তাঁহাদের সদ্ভাব ছিল। এমন কি, এইজন্যই অন্যান্য নিষাদগণ তাঁহাকে আর্যপদলেহী গৃহশত্রু বলিয়া সন্দেহ করিতেন এবং এইজন্যই সম্ভবত তাঁহার পত্নী গদ্‌গদা শবররাজ কিংকুর প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। গদ্‌গদা এবং কিংকু উভয়েরই স্বজাতিপ্রীতি অসাধারণ ছিল।

প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, গদ্‌গদা এবং কিংকুর ষড়যন্ত্রেই তরক্ষুরাজ বিপন্ন হইলেন। শেষে এমন অবস্থা হইল যে, ধনুর্বাণ মাত্র সম্বল করিয়া তাঁহাকে রাজ্যত্যাগ করিতে হইল। চিরাচরিত প্রথানুসারে তরক্ষুরাজ শ্মশানচারী জাদুকর চেম্বার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। চেম্বার অভিমত, বুদ্ধি-ভ্রংশই তাঁহার অধঃপতনের কারণ। পুনরায় বুদ্ধিমান হইবার উপায়ও চেম্বা নির্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অভীষ্ট বস্তুটি কিছুতেই মিলিতেছে না। এতদিন কত কান্তারে, কাননে, নদীতটে তিনি পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কই— সহসা নিষাদের চক্ষুর্দ্বয় প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল।

ওই তো এক জোড়া কাম-ক্রীড়া পরায়ণ কোঁচ বক্‌!

তৎক্ষণাৎ নিষাদ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ধনুতে শরযোজনা করিয়া কামোন্মত্ত পুংবকের হৃদয়-দেশ বিদীর্ণ করিয়া সোল্লাসে লাফাইয়া উঠিলেন। বকী উড়িয়া গেল।

চেম্বার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইবার নহে।

রতি-ক্রীড়া-পরায়ণ পুংবকের মাংস ভক্ষণ করিবামাত্র নিষাদের সুপ্ত বুদ্ধি যেন জাগরিত হইয়া উঠিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া প্রতাপশালী আর্যগণের দ্বারস্থ হইলেন। আর্যগণ চিরকাল আশ্রিতবৎসল ও ন্যায়-পরায়ণ। সুতরাং তাঁহারা শবররাজের বিরুদ্ধে ন্যায়-যুদ্ধ ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না।

ভয়াবহ যুদ্ধ হইল। শত যোজন ব্যাপিয়া দিবারাত্রি যুদ্ধ। আকাশে বাতাসে কেবল কাড়া-নাকাড়া-দামামা-ভেরীর শব্দ; চতুর্দিকে ছিন্নমুণ্ড, কর্তিত হস্ত, বিচ্ছিন্ন পদ, বিদীর্ণ উদর, বিকৃত কবন্ধের স্তূপ; গ্রামে গ্রামে প্রজ্বলিত গৃহ, পথে-বিপথে পলায়নপর নরনারী, ধাবমান সৈন্যসামন্ত, ক্রন্দনে কলরবে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ।

তরক্ষুরাজ-কণ্ঠেই বিজয়লক্ষ্মী বরমাল্য দান করিলেন।

রণক্ষেত্রে কিংকুর চক্ষু উৎপাটন ও হৃদয় বিদারণ করিয়া নিষাদের প্রতি-হিংসা কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। গদ্‌গদার ব্যবস্থা গৃহে হইবে। রথারোহী হইয়া তিনি নিষ্কণ্টক রাজ্যে সদম্ভে পুনঃপ্রবেশ করিলেন—রথের পশ্চাতে গদ্‌গদার চুলের ঝুঁটি বাঁধা। প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া তরক্ষুরাজ গদ্‌গদাকে একটি ন্যগ্রোধ বৃক্ষের কাণ্ডে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে তাহার অনাবৃত দেহে শঙ্কর-মৎস্যোৎপন্ন কশাদ্বারা অবিরাম আঘাত করিতে লাগিলেন। শাসন সমাপ্ত হইলে নদীজলে কয়েকবার চুবাইয়া তৎপর তাহাকে অন্তঃপুরে স্থান দিলেন।

এই ব্যাপার হইতেই সতীত্ব জিনিসটির উদ্ভব এবং ইহার পর হইতেই আর্যসভ্যতার বিস্তার। তরক্ষুরাজের সহায়তা ভিন্ন আর্যসাম্রাজ্যের এত দ্রুত বিস্তার হইত না।

সংক্ষেপে ইহাই প্রকৃত ইতিহাস।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইতিহাসে ইহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। এ সম্পর্কে ইতিহাসে যেটুকু উল্লেখ আছে, তাহা সামান্য এবং ইতিহাসের দিক দিয়া অতিশয় হাস্যকর। শরাহত পুংবককে দেখিয়া বাল্মীকি নামক জনৈক বুড়া ব্রাহ্মণ নাকি দুই ছত্র সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়াছিলেন।

আশ্চর্য!

সত্যই তো, দোলের দিন। অখিলবাবুরা যে পাড়ায় বাস করেন সে পাড়ায় সুজাতা দেবীর স্বস্তি না পাবারই কথা। আশেপাশে যত কুলি মুটে মিস্ত্রী মারোয়াড়ী। ছোটলোকের পাড়া। অখিলবাবুরা এসে পর্যন্ত খুঁতখুঁত করছেন সবাই। অখিলবাবুর তুই মেয়ে অনিমা তনিমা তো বটেই, ছোট খোকা ওস্তাদ পর্যন্ত। সুজাতা দেবীর তো কথাই নেই। তিনি বিলেত-ঘরের মেয়ে। ফিরপো, লেড্‌ল, হ্যামিল্‌টন, আরমি-নেভির আবহাওয়ায় মানুষ। অখিলবাবুর হাতে পড়ে তাঁর অধঃপতনই হয়েছে একথা তিনি এবং তাঁর স্বজনবর্গ সবাই জানেন, বলেনও। কিন্তু নিয়তির ওপর তো আর কথা চলে না। অখিলবাবু সাবডেপুটি। সম্প্রতি এই শহরে বদলি হয়ে এসেছেন। জিতেনবাবুর ওপর বাড়ি ভাড়া করবার ভার ছিল। জিতেনবাবু অখিলবাবুর অধস্তন কর্মচারী। তিনি আলো, হাওয়া, সস্তা, এইসব দেখে বাড়িটা পছন্দ করেছিলেন, পাড়াটাও খুব খারাপ বলে তাঁর মনে হয়নি। কিন্তু তাঁর মন আর সুজাতার মন আকাশ-পাতাল তফাত যে। সেকথা সুজাতা মুখ ফুটে বলেও দিয়েছেন তাঁকে একদিন। জিতেনবাবু ভদ্রতর পাড়ায় একটা বাড়ি খুঁজে বার করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। চাকরি বজায় রাখতে গেলে এসব করতেই হবে। উপায় কি!

কোনোক্রমে তবু চলছিল, দোল এসে পড়াতে ব্যাপারটা কিন্তু জটিলতর হয়ে উঠল। অনিমা-তনিমার বয়স হয়েছে, তাদের নিয়েই আরও বেশি মুশকিল হ'ল। পাড়ায় যত সব অসভ্য লোকদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কাঁহাতক চলতে পারে মানুষ! দোলের হিড়িকে আরও বেয়াদব হয়ে উঠেছে যেন সবাই। শুক্লপক্ষ যেদিন থেকে পড়েছে সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছে। বাড়ির পাশে খানিকটা মাঠ আছে। সন্ধ্যের পর সেখানে এসে লোকগুলো গান-বাজনার নামে যে হল্লা হৈ-হৈটা করেছে এ ক'দিন তা বলবার নয়। গান-বাজনারই বা কি বাহার—খচ-খচ-খচ-খচ আর তার সঙ্গে বেসুরো

চিৎকার তাড়ির ভাঁড় সামনে রেখে। এ ক'দিন এতটুকু স্বস্তি ছিল না বাড়িতে। অনিমা সন্ধ্যের পর সেতার বাজায়, তনিমা স্বরলিপি দেখে গান শেখে, কিন্তু কানের কাছে এই তাণ্ডব হতে থাকলে কি আর কিছু করা যায়? ওস্তাদের পড়াও শিকেয় উঠেছে। পাড়ার যত অসভ্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে এরই মধ্যে দুটো-একটা খারাপ কথা শিখেছেন ছেলে। এ পাড়ায় থাকলে জংলী বুনো হয়ে যাবে ও। অখিলবাবু সকালে খেয়ে কোর্টে বেরিয়ে যান, ফেরেন পাঁচটায়। জলখাবার খেয়েই আবার ক্লাবে যান, ফেরেন রাত দশটায়। যত ঝঞ্ঝাট সুজাতাকেই পোয়াতে হয়। এরকম অসভ্য পাড়ায় সুজাতা আর কখনও থাকেননি। জানলা খুলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধবার জো নেই—হাঁ করে চেয়ে দেখবে। আবার এখানে এসে কপালগুণে যে চাকর বামুন আর দাই জুটেছে তারা এমন আনাড়ি যে তাদের পিছনে ঘুরতে-ঘুরতেও সুজাতার প্রাণ অন্ত হবার যোগাড় হয়েছে। বোনপোর জন্যে যে শোয়েটারটা বুনতে শুরু করেছিলেন, এবার শীতে সেটা শেষই করতে পারলেন না।

ছ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—

ওই আসছে। এখনই একদল গেল, আবার আসছে আর-একদল। উঃ, কাল থেকে কী কাণ্ডই যে হচ্ছে! কাল "ধূর-খেল" ছিল। সে কী কাণ্ড! ছেলে বুড়ো সবাই আপাদমস্তক ধুলোকাদা মেখে ভূতের মতন ঘুরে বেড়িয়েছে রাস্তায় দল বেঁধে! সামনে কাউকে পেলেই হ'ল, অমনি সমস্বরে চিৎকার করে তাকে ঘিরে ধরেছে—আর তার গায়ে মুখে মাথায় ধুলোকাদা মাখিয়ে তাকেও ভূত বানিয়ে নাস্তানাবুদ করে তবে ছেড়েছে। নর্দমা থেকে পাঁক তুলে ছোঁড়াছুঁড়ি করতেও বাধছিল না লোকগুলোর। হি হি করে হাসতে হাসতে দু'হাত তুলে নাচছিল আবার। মানুষ না ভূত প্রেত! ছি ছি ছি ছি!

ছ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—

"অনিমা, সরে আয় ওখান থেকে—"

কিন্তু ওরা বোধ হয় অনিমাকে দেখতে পেয়ে গেল। হৈ-হৈ করে উঠল সমস্বরে। গলির দিকে জানলাটা খোলা ছিল। সুজাতা এগিয়ে গিয়ে

দেখলেন একদল ফাগমাখা ছোঁড়া ঢোল আর খঞ্জনী বাজিয়ে মহানন্দে নৃত্য করছে। দড়াম করে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

ছ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—

মুখে মুখে তৈরি করে একটা অশ্লীল ছড়া তারস্বরে গেয়ে দিলে একজন। অনিমার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। সুজাতা গুম হয়ে বসে রইলেন। লোকগুলো যাবার নাম করে না। সুজাতার চোখের দৃষ্টিতে আগুন লাগল। উনিও আজ সকাল থেকেই বেরিয়েছেন। এমন এক লক্ষ্মীছাড়া এস. ডি. ও. জুটেছে যে ছুটির দিনেও রেহাই দেবে না। খানিকক্ষণ বসে থেকে সুজাতা হঠাৎ ছাতে উঠে গেলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। নিচে বসে থাকা নিরাপদ মনে হ'ল না। কিন্তু ছাতেও বিপদ ছিল। যেতে-না-যেতেই কোথা থেকে এক-পিচকিরি রঙ এসে লাগল তাঁর শাড়িতে। কে দিলে দেখতে পেলেন না। আশেপাশে সব ছাত, আলসের পাশে কে কোথা লুকিয়ে আছে দেখা যায় না। রাগে বিরক্তিতে সমস্ত মনটা ভরে উঠল তাঁর। এত বড় স্পর্ধা! নিচে নেমে এলেন দুমদুম করে।

"রামশরণ—"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে চাকরকে ডাকলেন। সাড়া পাওয়া গেল না।

"দুবেজি—"

ঠাকুরেরও সাড়া নেই। খিড়কি খুলে দু'জনেই বেরিয়ে গেছে। অল্পবয়সী দাইটা উঠানে বাসন মাজছিল। সে আজ ছুটি চেয়েছিল কিন্তু সুজাতা ছুটি দেননি। তার হলদে রঙের ছোপানো আধময়লা শাড়িতেও এক-পিচকিরি রং কে যেন দিয়েছে। বাঁদর সব! বুনো! জংলী!

"উ লোককো বোলাও, আর কেবাড়ি লাগা দেও—"

সুজাতার ভয় হতে লাগল ওই ভিড়টা যদি উঠানে ঢুকে পড়ে তাহলেই তো সর্বনাশ। তাড়াতাড়ি মেয়েদের নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি।

খিড়কি দরজা দিয়ে দাই মুখ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে হর্ষধ্বনি উঠল।

ছ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—

সুজাতা বাথরুমে ঢুকে রঙ দেওয়া কাপড়টা ছেড়ে তখনি রঙটা ভালো করে ধুয়ে ফেললেন। ভিজিয়ে দিলেন কাপড়টা।

ক্রমশ বাইরের হল্লাটা কমে গেল, মনে হ'ল তারা চলে যাচ্ছে। খিড়কি বন্ধ করার শব্দ পাওয়া গেল। সুজাতা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন দাইটাকে লাল রঙে চুবিয়ে দিয়েছে ব্যাটারা একেবারে, ভিজে কাপড় গায়ে সেঁটে গেছে। বেহায়া মেয়েটা মুচকে মুচকে হাসছে তবু। রামশরণ এবং ছুবেজিরও আপাদমস্তক রঞ্জিত এবং তারাও আনন্দে গদগদ।

কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

"উনি এলেন বোধ হয়—"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুজাতা তাড়াতাড়ি কপাটটা খুলেই ভয়ে বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেল।

জিতেনবাবুর একি অদ্ভুত চেহারা! ভদ্রলোকের মাথায় মুখে কামিজে কাপড়ে লাল নীল সবুজ হলদে বেগুনী কোনো রঙ আর বাকি নেই।

"একি কাণ্ড—"

অপ্রস্তুত মুখে জিতেনবাবু বললেন, "একটা ভালো বাড়ির খবর পেয়েছি, তাই ভাবলাম খবরটা বলে যাই—"

"কোথায়—"

জিতেনবাবু যে পাড়ার নাম করলেন সেটা এখানকার নামজাদা পাড়া: সাহেব-সুবো-অফিসারদের পাড়া। সুজাতা অকূলে কূল পেলেন যেন!

"কবে খালি হবে?"

"কাল খালি হয়েছে।"

"ও, যে বাড়িতে ডি. এস. পি. ছিলেন?"

"হ্যাঁ, সেইটেই।"

"সে তো চমৎকার বাড়ি। এখনই যাওয়া যায়?"

"এখনই?"

"এখনই যাব তাহলে। এখানে চতুর্দিকে যা কাণ্ড ঘটছে—"

"কেন কি হ'ল—"

"কপাট বন্ধ করে বসে আছি সকাল থেকে—"

জিতেনবাবু সুজাতা দেবীর শুভ্র কাপড়খানার দিকে চেয়ে দেখলেন। সুতীর হলেও দামী কাপড়। রঙ লেগে নষ্ট হয়ে গেলে সত্যিই কষ্টের কারণ ঘটবে।

"আচ্ছা দেখি তাহলে—"

জিতেনবাবু চলে গেলেন।

সুজাতা দেবী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছোতে শুরু করলেন। একটু পরে এক ছ্যাকড়া গাড়িতে চেপে অখিলবাবু এলেন। গাড়োয়ান লালে লাল, ঘোড়া দুটোর গায়েও রঙ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় অখিলবাবুও নিস্তার পাননি।

"রাস্তায় দিলে বুঝি কেউ—"

"না, রাস্তায় দেয়নি। দিলেন স্বয়ং এস. ডি. ও.। ভদ্রলোক সেকেলে গোঁড়া লোক, কি আর করি বল—"

"সোফাটায় বোসো না যেন ধপ করে। কাপড়চোপড় ছাড় আগে। ছি ছি, পাঞ্জাবিটা নষ্ট করে দিয়েছে একেবারে, এমন দামী সিল্কটা—"

দুই

সন্ধ্যা আসন্ন।

উন্মত্ত জনতা আনন্দে অধীর হয়ে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়-রাস্তায়। তাদের আনন্দ-কলরব এখনও থামেনি। আম্রমুকুলের গন্ধে আকাশ-বাতাস মদির হয়ে উঠেছে, অশোক পলাশ কিংশুকের পল্লবে পল্লবে জীবনবহ্নি লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে যেন, স্বর্ণকান্তি কর্ণিকার-পুষ্পভারে শাখা-প্রশাখা অবনত, শুভ্রকুন্দকুসুমগুচ্ছ ঠিক তেমনিভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে প্রিয়াদন্তপংক্তিশোভা, কালিদাসের কালে যেমন দিত। কোকিল ডাকছে, ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত হয়ে উঠেছে কাননকান্তার, প্রাকৃতজনতা সমস্ত লজ্জা সমস্ত ভব্যতা বিসর্জন দিয়ে রঙে-রসে আনন্দে-নেশায় বিভোর হয়ে উন্মত্তের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনও।

ছ্যাকড়া গাড়ির দরজা-জানলা এঁটে বন্ধ করে সুজাতা দেবী চলেছেন সভ্য পাড়ায়।

আমাদের পাড়ায় নবাগত যতীনবাবু লোকটিকে এক হিসাবে অভদ্রই বলা চলে। সমাজের সাধারণ আইনকানুন মেনে কিছুতেই চলবেন না ভদ্রলোক। কোথাও নিমন্ত্রণ করলে যান না, পাড়ার কারো খবর নেন না, বাড়িতে কেউ গেলে আপ্যায়িত হবার ভাব দেখান না, বরং ভাব-ভঙ্গীতে প্রকাশ করেন যেন একটু বিরক্তই হয়েছেন। তবু আমরা প্রায় প্রত্যহ বৈকালে তাঁর বাড়িতে যাই, এসব সত্ত্বেও এবং নিয়মিতভাবে চা পান করে থাকি। যতীনবাবুর চরিত্রে যতই খুঁত থাক তাঁর বাড়ির চা-টি একেবারে নিখুঁত। সেদিন বিকেলে আমরা যখন গেলাম—আমরা মানে আমি, মাধববাবু আর পুণ্ডরীকাক্ষবাবু—তখন তিনি আর একজন কার সঙ্গে যেন গল্প করছিলেন। ভদ্রলোককে ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছি বলে মনে হ'ল না। যতীনবাবুর যা স্বভাব আমাদের দিকে এক নজর চেয়ে দেখলেন মাত্র কিন্তু মুখের ফাঁকে যে একবার 'আসুন' বা 'বসুন' বলা তা একবারও না, গল্পই করে যেতে লাগলেন। তবু আমরা বসলাম।

যতীনবাবু বলছিলেন—"ছেলেবেলা থেকেই ওই রকম। পাণ্ডাগিরি করে বেড়াত ইস্কুলে, আর সেই সময়েই মদ খেতে শেখে বোধ হয়—"

পুণ্ডরীকাক্ষবাবু আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না।

"আমাদের হেমবাবুর ছেলে ফটিকের কথা বলছ বুঝি?"

যতীনবাবু এর কোনো জবাব দিলেন না, একটু হেসে সেই লোকটির দিকে চেয়ে বলে যেতে লাগলে—"তারপর তার বাপ তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে, অবশ্য ঠিক যে কেন ছাড়িয়ে নিলে তা বলা শক্ত, কিন্তু ছাড়িয়ে নিলে, ছাড়িয়ে পাঠিয়ে দিলে বেহারের এক শহরে তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি—ইতিমধ্যে ছোকরা কবিতা লিখতে শুরু করেছিল।"

মাধববাবু পুণ্ডরীকাক্ষবাবুর দিকে চেয়ে ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে বললেন,

"আমাদের জগার কথা বলছেন, বুঝছ না—" বার দুই আই-এ. ফেল করে আমাদের তপোনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র জগদীশ পরের পয়সায় মদ এবং সিনেমার কাগজে প্রেমের পদ্য লিখতে শুরু করেছিল, সম্প্রতি সে ছাপরাও গেছে মামার বাড়িতে। সুতরাং মাধববাবুর অনুমান খুব অসঙ্গত নয়। যতীনবাবু কিন্তু সমর্থন বা প্রতিবাদ কিছুই করলেন না।

বলে যেতে লাগলেন—

"বেহারে গিয়ে তার কাব্যরোগ হু-হু করে বেড়ে গেল। বেহারে তার বাপ তাকে পাঠিয়েছিল আত্মীয়ের কাছ থেকে সেই আত্মীয়েরই কারবারে ওয়াকিবহাল হবার জন্যে। ছোকরা কারবারের ধার দিয়েও গেল না, লম্বা লম্বা কবিতা লিখে মাসিকে আর সাপ্তাহিকে পাঠাতে লাগল আর বাকি সময়টা ঘরের কোণে বসে কাটাতে লাগল যত ভব বাজে বই পড়ে—"

অপরিচিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—"বাজে বই মানে, কি বই—"

"দর্শন, কাব্য, সাহিত্য—এই সব আর কি, অর্থাৎ ইনডিগো সম্বন্ধে কোন বই নয়—"

"ইনডিগো সম্বন্ধে বই মানে—"

"অর্থাৎ যে বই পড়লে ব্যবসার উপকার হ'ত সেই আত্মীয় ভদ্রলোকের নীলের কারবার ছিল—"

"তারপর?"

"তারপর আর কি, উত্যক্ত হয়ে উঠলেন আত্মীয়টি ক্রমশ—"

চা এসে পড়ল। পুণ্ডরীকাক্ষ আপিঙের কৌটা বার করলেন। ইনডিগো শুনেই আমরা বুঝেছিলাম এ জগো নয় আর কেউ। মাধব ভাবছিলেন কে হতে পারে।

যতীনবাবু বললেন—"তারপর হ'ল এক কাণ্ড। কলকাতার এক সম্পাদক ডেকে পাঠালে ছোকরাকে, বললে, তোমার প্রতিভায় আমি মুগ্ধ, তুমি আমার কাগজের সহকারী সম্পাদক হও আর তোমার কবিতাগুলো ছাপিয়ে ফেল—ছুটল ছোকরা কলকাতায় আর জুটল গিয়ে সাহিত্যিক মহলে—"

অহিফেনের বটিকাটি গলাধঃকরণ করে পুণ্ডরীকাক্ষ বললেন—"আমাদের

ক্ষীরোদচন্দ্র আর কি—" ক্ষীরোদের সঙ্গে এই ছোকরার একটু মিল ছিল অবশ্য, ক্ষীরোদও একটা কাগজের সহকারী সম্পাদক হয়েছিল কিছুদিন।

যতীনবাবু বলতে লাগলেন—"ছোকরা কিন্তু জমিয়ে ফেললে কলকাতায়—"

যদিও যতীনবাবু পুণ্ডরীকাক্ষের দিকে ফিরেও চাননি তবু পুণ্ডরীকাক্ষ বললেন "তাই নাকি?"

"খুব জমিয়ে ফেললে, সাহিত্যিক মহলে নাম তো হ'লই, অসাহিত্যিকরাও বলাবলি করতে লাগল তার বিষয়ে, ফলে একটা চাকরি জুটে গেল।"

অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন—"কি চাকরি?"

"ইস্কুল-মাস্টারি—"

"তারপর—"

"দিনকতক খুব নামডাকও হ'ল খুব ভালো মাস্টার খুব ভালো মাস্টার, অতিরিক্ত রকম বাহাদুরি করতে গিয়েই ম'ল ছোকরা—"

"কি রকম—"

"ছাত্রদের সঙ্গে খুব বেশিরকম মাখামাখি শুরু করে দিলে, ছাত্ররা হয়ে উঠল তার ইয়ার—"

মাধববাবু চা পানান্তে ময়লা রুমাল দিয়ে ঝোলা গোঁফ-জোড়া মুছলেন। তিনি এই কথায় একটু টিপ্পনী করলেন—"আজকালকার ছেলেদের ধরণ-ধারণই ওই রকম,—বুঝতে পেরেছি আমাদের আশু মাস্টারের কথা বলছেন আপনি, ওর হিস্ট্রি জানেন না কি?"

যতীনবাবু একটু হাসলেন মাত্র, কোন জবাব দিলেন না। আমাদের এখানকার স্কুলের নবাগত শিক্ষকটি বদনাম রটেছিল তিনি ছেলেদের সঙ্গে বড্ড বেশি মেশেন না কি।

অপরিচিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—"তারপর—"

"তারপর আর কি, চাকরটি গেল। নানারকম বদনাম রটতে লাগল, গার্জেনরা ভয় পেলেন ছেলেদের মতিগতি বিগড়ে যাবে, কমিটি তাড়িয়ে দিলে মানে দিতে বাধ্য হ'ল।"

"ছেলেদের মতিগতি বিগড়ে যাবে! কেন?"

"ও ছেলেদের সঙ্গে মদ খেত, বলত ধর্মটর্ম সেকেলে বন-মানুষের কাণ্ড-কারখানা এ যুগে ওসব অচল। বলত কুসংস্কার তুলে দাও—ফ্রেঞ্চ রেভলিউ-শনের গল্প করত, বেন্থাম মিল আওড়াত—"

"তারপর—"

"এদেশে আর কত 'তারপর' থাকবে, দিন কতক ভ্যারেণ্ডা ভেজে ভেজে ঘুরে বেড়ালে, বুড়োদের উপদেশ আর গালাগালি শুনলে, তারপর পট করে একদিন মরে গেল—"

"মরে গেল! কেন, কি হ'ল—"

"কলেরা।"

মাধববাবু বললে—"বুঝেছি, নিপুর ভাগ্নের কথা বলছেন, সেও কল-কাতায় মাস্টারি করছিল, একটু বখাটে গোছেরই ছিল, বছরখানেক হ'ল মারা গেছে। নিপুর ভাগ্নের কথাই বলছেন, নয়?"

পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতিবাদ করলে—"নিপুর ভাগ্নে মদ খেত না। মদ খেত আমাদের ছিরে, মাস্টারিও করত, কিন্তু সে মরে গেছে টাইফয়েডে, আপনি বোধহয় ভুল খবর শুনেছেন যতীনবাবু—"

যতীনবাবু আবার একটু হাসলেন, জবাব দিলেন না। এমন অভদ্র-লোক কদাচিৎ চোখে পড়ে!

অপরিচিত লোকটির দিকে চেয়ে যতীনবাবু বললেন, "শ্রদ্ধা হয় লোকটার উপর?"

অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন—"এই আপনার গ্রেট ম্যানের গল্প?"

"নামটা চেপে রেখেছি বলে মনে হচ্ছে না, নামটা আগে বললে প্রতি পদে গ্রেটনেস দেখতে পেতে। I hate you, I hate you all."

"নামটা কি, শুনি।"

"হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।"

যাঁহাদের গায়ের চামড়া সাদা তাঁহাদের একটা প্রধান গুণ তাঁহারা ভারি পরোপকারী। পরের, বিশেষত কালা আদমীর, উপকার করিতে পারাটাই যেন তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া, পর্বত মরুভূমি অতিক্রম করিয়া কেবলই তাঁহারা পরোপকার করিয়া বেড়াইতেছেন।

সদ্য-পাস-করা ক্যাপটেন জোন্স আই. এম. এস. মহাশয়ও ভারত-ভূমিতে পদার্পণ করিয়াই পরোপকারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 'ট্যুর' বাহির হইয়া তাঁহার অধীন জনৈক নেটিভ ডাক্তারের নিকট একদা নিজের মহৎ অভিপ্রায়টি ব্যক্তও করিলেন। অবশ্য ইংরাজীতে।

"দেখ, আমি ঠিক করিয়াছি বিনা পারিশ্রমিকে গরিবদের চোখের ছানি কাটিয়া দিব। তুমি রোগী যোগাড় করিয়া সদর হাসপাতালে পাঠাইয়া দিও।"

নেটিভ ডাক্তারটি কালা আদমী। সুতরাং অকৃতজ্ঞ। সাহেবের এবম্বিধ উদারতায় গদগদ না হইয়া মনে মনে বাংলায় বলিলেন—"ব্যাটা হাত পাকাবার মতলবে আছে।"

মনের কথা কিন্তু মুখে বলিতে পারিলেন না। সাহেব মানুষ, তাহার উপর মনিব। সুতরাং ভুল ইংরাজীতে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এই—"ও ইয়েস সার্! এ তো খুব ভালো কথা। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার হাসপাতালে যে সব রোগী আসে তাহারা সাধারণত বড় গরিব। ট্রেনের ভাড়া দিয়া যাইতে পারিবে কি না সন্দেহ!"

সাহেব দমিলেন না, তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"বেশ তো, তেমন গরিব যদি হয় আমিই তাহার যাইবার খরচ বহন করিব। তুমি যত পার রোগী যোগাড় কর। ভাড়ার জন্য আটকাইবে না। এখান হইতে সদরে তৃতীয়

শ্রেণীতে যাইবার মাশুল আট আনা আমিই দিয়া দিব। বল তো পাঁচটা টাকা তোমাকে অগ্রিম দিয়া যাইতেছি।"

ডাক্তারবাবু দেখিলেন ব্যাটা বদ্ধপরিকর।

বলিলেন—"না না, টাকা অগ্রিম দিতে হইবে না। রোগী যোগাড় হইলে ভাড়ার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার এখানে তো চোখে-ছানি-পড়া রোগী আসে না। যদি আসে এবং যাইতে চায় আমি আপনাকে খবর দেব।"

"থ্যাঙ্কিউ।"

সাহেব চলিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবুও মনে মনে 'শ'কার 'ব'কার যথারীতি দাদের মলম কুইনিন মিক্সচার প্রভৃতি পরিবেশনে মন দিলেন। দিন কাটিতে লাগিল। প্রায় পনরো দিন কাটিল। ইহার মধ্যে ডাক্তারখানায় কোনো 'ক্যাটারারূট' রোগী আসিল না। আসিলে হয়তো ডাক্তারবাবু চেষ্টা করিতেন। চাকরি করেন। মনিবের মনোরঞ্জনের সুযোগ পাইলে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। কিন্তু সুযোগ আসিল না। ক্রমশ তিনি সেকথা ভুলিয়া গেলেন। সাহেব কিন্তু ভোলেন নাই। তাহার প্রমাণ কয়েকদিন পরেই পাওয়া গেল। একটি টাইপ-করা পত্র আসিয়া উপস্থিত।

প্রিয় ডাক্তারবাবু,

আশা করি ক্যাটারাক্ট বিষয়ক আমার প্রস্তাবটি আপনি ভুলিয়া যান নাই। ইতিমধ্যে কিন্তু আর একটি সুযোগ ঘটিয়াছে। কয়েকদিন পূর্বে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিস্টার সরকারকে আমার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহ করিয়া একটি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক থানার দারোগাকে জানাইয়াছেন যে প্রত্যেকের এলাকায় যত অন্ধ রোগী বা রোগিণী আছে তাহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আপনার নিকট চৌকিদারসহ যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আগামী রবিবার দিন বিভিন্ন এলাকা হইতে আপনার হাসপাতালে রোগী সমবেত হইবে। আমি সকালের ট্রেনে যাইব এবং অপারেশনের উপযুক্ত রোগী নির্বাচন করিয়া আসিব। তাহাদের আপনি যত্ন করিয়া বসাইয়া রাখিবেন এবং বলিবেন

যে, তাহাদের যাতায়াতের ভাড়া আমি দিব। তাহারা হাসপাতালে থাকিবে। কোনো খরচ লাগিবে না। যদি খুব গরিব হয় চশমাও কিনিয়া দিব। আশা করি আপনি এ বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। ইতি—

বশম্বদ

জে. জোন্‌স

ক্যাপটেন আই এম. এস.

ডাক্তারবাবু আর একবার মনে মনে 'শ'কার 'ব'কার করিলেন। এ আবার এক ফ্যাসাদ জুটিল। একটি কথা মনে করিয়া তিনি একটু পুলকিতও হইলেন। নি-খরচায় কেবলমাত্র ফফরদালালি করিয়া যদি সাহেবটাকে খুশী করিতে পারেন, মন্দ কি? অনেকদিন হইতে সাধ একটা ভালো জায়গায় বদলি হইবার। সাহেব প্রসন্ন হইলে তাহা অচিরাৎ সম্ভব।

দুই

নির্দিষ্ট দিবসে হাসপাতালের সম্মুখস্থ ময়দানে বিভিন্ন থানা হইতে পুলিস কর্তৃক নীত হইয়া বহু চক্ষু-রোগী সমবেত হইল। বিরাট জনতা, সকলেরই চোখে যে ছানি পড়িয়াছে তাহা নয়, কিন্তু থানার দারোগারা তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। পুলিস সাহেবের হুকুম—চোখের অসুখ থাকিলেই তাহাকে হাজির করিয়া দিবে—সিভিল সার্জন বাছিয়া লইবেন। তাঁহারা নিখুঁতভাবে হুকুম পালন করিয়াছেন। এত চক্ষু-রোগী দেখিয়া ডাক্তারবাবুরও চক্ষু স্থির হইয়া গেল। তিনি ইহাদের ভিতর হইতে ছানিগ্রস্ত রোগীগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া একধারে জড়ো করিতে লাগিলেন। করিতে গিয়া দেখিলেন কেহই আলাদা একটা দলভুক্ত হইতে রাজী নয়। কেবল পুলিসের ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিতেছে না। একটি বৃদ্ধ থর থর করিয়া কাঁপিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—"আমাকে ছেড়ে দিন বাবু, আমার ঘরে আমার বুড়ী ছাড়া আর কেউ নেই, আমি চলে গেলে তাকে দেখবে কে? দোহাই ডাক্তারবাবু, আমাকে বাদ দিন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এতে ভয় পাবার কী আছে! সাহেব নিজের

খরচে তোমাকে নিয়ে যাবেন, তোমার চোখ ভালো হয়ে গেলে আবার তুমি ফিরে আসবে।”

বৃদ্ধটি ডাক্তারবাবুর সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না। কিন্তু তাহার ভয় ঘুচিল না। বেচারা দাঁড়াইয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

একটু পরেই ভয়ের কারণটা বোঝা গেল। তখন ‘সারা-ব্রিজ’ তৈয়ারি হইতেছিল। কে যেন রটাইয়া দিয়াছিল যে, নর-কঙ্কাল দিয়া ব্রিজের বনিয়াদ পোক্ত করিবার জন্য গভর্নমেন্টের এই আয়োজন। কানাগুলোকে লইয়া সেইখানে পুঁতিবে। জীবন্ত পোঁতা যায় না—তাই চিকিৎসার ছুতোয় হাসপাতালে লইয়া গিয়া আগে শেষ করিবে—তাহার পর সারা-ব্রিজে চালান দিবে। সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সুশাসন সত্ত্বেও এই অসম্ভব গুজবে কেহ অবিশ্বাস করে নাই। পুলিস কর্তৃক রোগী সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া তাহারা সত্যই ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদের চোখের অসুখের জন্য পুলিসের এত মাথাব্যথা কেন? বিরাট জনতা ভয়ে থমথম করিতেছে। কখন কী হয়।

তিন

যথাসময়ে সাহেব আসিয়া পড়িলেন। ডাক্তারবাবু যে কয়েকটি ক্যাটারাক্ট রোগীকে আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন, সাহেবকে সেই স্থানে লইয়া গেলেন। এত রোগী দেখিয়া সাহেব মহাখুশী। ডাক্তারবাবু ভিড়ের ভিতর হইতে একটি বৃদ্ধকে হাত ধরিয়া বাহির করিয়া আনিলেন। আবক্ষ সাদা দাড়ি, পাকা ভুরু, দুই চোখেই ছানি পড়িয়াছে। একেবারে অন্ধ।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—“এই কেসটি আমার খুব ভালো বলিয়া মনে হইতেছে।”

“চোখের টেন্‌শন্ দেখিয়াছ?”

“আপনি দেখুন।”

বৃদ্ধ ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে।

“ডরো মাৎ, ডরো মাৎ, আচ্ছা হোগা।”

বৃদ্ধের কাঁপনি থামে না।

সাহেব তখন তাহাকে চক্ষু বুজিতে বলিয়া চোখের উপরের পাতায় আঙুল দিয়া ঈষৎ চাপ দিলেন—উদ্দেশ্য 'টেনশন' দেখা। সামান্য চাপ—লাগিবার কথা নয়—বৃদ্ধ কিন্তু দারুণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

"আঁ—আঁ—আঁ—"

চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। অন্ধ, অর্ধ-অন্ধ, চক্ষুষ্মান যে যেদিকে পারিল দৌড়াইতে লাগিল। কেহ পড়িয়া গেল, কেহ হোঁচট খাইল, কাহারও মাথা ঠুকিয়া গেল, কেহ ভিড়ে আটকাইয়া গিয়া চীৎকার জুড়িল। নিমেষের মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সাহেব হকচকাইয়া ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিলেন। ডাক্তারবাবু বলিলেন—"দেহাতী লোক, ভয় পাইয়াছে।" চৌকিদার লাঠি উঠাইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিতে গোলমাল আরও বাড়িল। তারস্বরে অনেকে আর্তনাদ শুরু করিয়া দিল। সাহেব চতুর লোক। নিমেষের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিলেন বল-প্রদর্শন করিলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে।

ডাক্তারবাবুকে বলিলেন—"যাহারা চলিতে যাইতে চায় তাহাদের বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। যে স্বেচ্ছায় যাইবে সে-ই চলুক। একজনও যদি যায় আপাতত তাই যথেষ্ট। তুমি এই লোকটিকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া বল।"

দাড়িওলা বৃদ্ধ তখনও সাহেবের কবলে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল।

"ভয়টা তোমার কিসের? এস তুমি আমার সঙ্গে।"

ডাক্তারবাবু তাহাকে লইয়া হাসপাতালের দিকে অগ্রসর হইলেন। সাহেব ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া আরও দুই-একজনকে বাগাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অনুভব করিলেন যে, তাহা অসম্ভব। তিনি যেদিকে যান সেইদিকেই হাহাকার পড়ে, যেদিকে চান সেইদিক হইতে সকলে পলায়ন করে।

স্বেচ্ছায় কেহই যাইতে রাজী নয়।

চার

দাড়িওলা বুড়াকে একটি নিভৃত ঘরে বসাইয়া ডাক্তারবাবু তাহাকে বুঝাইতেছিলেন।

"কিসের ভয়টা তোমার বল না।"

অনেকক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বৃদ্ধ অবশেষে কারণটা চুপিচুপি বিবৃত করিল।

"শুনছি না কি সারায় যে পুল হচ্ছে তাতেই আমাদের পুঁতবে।"

"পাগল না কি তুমি! তাহলে কি আমি তোমাকে পাঠাতে পারি?"

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝিতে পারিল; সত্যই তো, ডাক্তারবাবু যখন যাইতে বলিতেছেন তখন গুজবটা নিশ্চয়ই অমূলক। এই ডাক্তারবাবু তাহার ছেলেকে বাঁচাইয়াছেন, স্ত্রীকে বাঁচাইয়াছেন, তাহাকেও দুইবার যমের মুখ হইতে টানিয়া আনিয়াছেন। সব সময় 'ফিস্'ও লন নাই। ইনি জানিয়া-শুনিয়া তাহাকে কখনও এমন বিপদে ফেলিবেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের ইহাও মনে হইল—হয়তো ডাক্তারবাবু নিজেই জানেন না। সাহেব হয়তো ইঁহাকেও ধাপ্পা দিয়াছে। একথা কিন্তু সে প্রকাশ করিল না।

বলিল—"কোথায় পাঠাচ্ছেন আমাকে, আপনিই ওষুধ দিন। আপনার ওষুধেই আমার চোখ ভালো হয়ে যাবে। আপনার কাছে কি ওষুধ নেই?" ডাক্তারবাবু সোজাসুজি নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিতে পারিলেন না।

বলিলেন—"আমার কাছে যে ওষুধ আছে তাতে সারতে অনেক দেরি লাগবে। সাহেবের কাছে যাও, দু'দিনেই সেরে যাবে। অত বড় ডাক্তার, নিজে এসে সাধছে, এমন সুযোগ আর পাবে না। চলে যাও। কত যত্ন করবে দেখো। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, খেতে দেবে, পরতে দেবে, চোখ সারিয়ে চশমা পর্যন্ত দিয়ে দেবে। যাও, চলে যাও।"

বৃদ্ধ চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন—"একা যেতে সাহস না হয় তোমার ছেলেকে সঙ্গে নাও। ভয় কী, আমি যখন বলছি, চলে যাও।"

অনেক বলা-কহার পর পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ যাইতে রাজী হইল।

পাঁচ

ডাক্তারবাবুর কথায় অন্ধ বৃদ্ধের সত্যই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সাহেব সত্যই তাহার হিতৈষী এবং আপনার লোক। তাহা না হইলে কি সঙ্গে করিয়া এমন করিয়া লইয়া যায়! ডাক্তারবাবু নিজে আসিয়া ট্রেনে চড়াইয়া দিয়া গেলেন। ট্রেন ছাড়িলে বৃদ্ধ তাহার পুত্রকে চুপিচুপি বলিল—"সাহেব কোথায়? তার সঙ্গে আলাপ কর না একটু। বল, সাহেব আমি ভালো হয়ে গেলে—ঘরের তৈরি গাওয়া ঘি, দই, মাছ—তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

চক্ষুষ্মান পুত্র বলিল—"সাহেব তো ফাসটো কেলাসে উঠল। এটা থাড় কেলাস।"

"ও, তাই না কি! তবে যে বললে—"

বৃদ্ধ ইতস্তত করিয়া চুপ করিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে গন্তব্য স্টেশনে নামিতে হইল। ভাগ্যে পুত্রটি সঙ্গে ছিল, তাহা না হইলে নামিতে গিয়া বেচারা হয়তো পড়িয়া যাইত। গাড়ি হইতে নামিয়া বৃদ্ধ পুত্রকে বলিল—"ওরে, সাহেব কোথা, দেখ ভিড়ে আমাদের খুঁজছে হয়তো—"

"এই বুড্ঢা, হামারা সাথ চলো।"

"তুমি কে?"

"হাম সাহেবকা চাপরাশি।"

"সাহেব ডাকছে বুঝি? ও—চল, চল।"

"সাহেব মোটরমে গিয়া। তুম হামারা সাথ পয়দল চলো—"

বৃদ্ধ বিমূঢ়ের মতো ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পর ঢোঁক গিলিয়া বলিল—"চল।"

হাসপাতাল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ও তাহার পুত্র বিনিদ্রনয়নে একটি ঘরে পাশাপাশি জাগিয়া আছে। সামনে বারান্দা।

জুতা খটখট করিয়া নার্সরা যাতায়াত করিতেছে। মাঝে মাঝে কাহাকে যেন ধমকাইতেছে। চতুর্দিকে কার্বলিক অ্যাসিড ও আয়োডোফর্মের গন্ধ। পাশের ঘর হইতে কাহার যেন অস্ফুট কাত্‌রানি শোনা যাইতেছে।

আসিয়া পর্যন্ত সাহেবের সহিত বৃদ্ধের দেখা হয় নাই। অন্য আর একজন ডাক্তারবাবু আসিয়া তাহার দাড়ি-গোঁফ, এমন কি, ভুরু পর্যন্ত কামাইয়া দিয়াছেন। চোখে কী একটা ঔষধ দিয়া চোখটা বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন। চোখের ভিতরটা জ্বালা করিতেছে।

বারান্দায় পদশব্দ হইল।

বৃদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কী?"

পুত্র চুপি চুপি উত্তর দিল—"আর একটা।"

"আর একটা মড়া?"

"হ্যাঁ, এই নিয়ে তিনটে হ'ল।"

সেদিন হাসপাতালে মৃত্যুসংখ্যা বেশী।

বারান্দার এক প্রান্ত হইতে সুরামত্ত একটা ডোম জড়িতকণ্ঠে বলিল—"সব শালা খতম হোগা আজ।"

খানিকক্ষণ কোনো শব্দ নাই।

"বাপ রে—বাপ রে—জান গিয়া—ওঃ ওঃ—"

তীব্র কণ্ঠে কে যেন কোথায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

আবার চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

ভোর হইতেছিল।

ডাক্তারবাবু বিনিদ্রনয়নে জাগিয়া ছিলেন। কল্পনা করিতেছিলেন যে, সাহেব যদি খুশী হয় তাহা হইলে হয়তো তাঁহাকে মুরারিগঞ্জ ডিস্‌পেনসারিতে বদলী করিতে পারে। তাহা যদি করে তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই বেলারানীকে আনিতে পারিবেন। মুরারিগঞ্জে কোয়ার্টার্স আছে। নবোদ্ভিন্নযৌবনা বেলারানীর ঢলঢলে মুখখানি মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই বুড়াটাকে বুঝাইয়া যখন পাঠাইতে পারা গিয়াছে তখন আরও দুই-চারিজনকেও হয়তো পারা যাইবে। তাহা হইলে হয়তো—

"ডাক্তারবাবু—"

আর্তকণ্ঠে বাহিরে কে যেন ডাকিয়া উঠিল।

"কে—"

ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন।

প্রথমটা তিনি চিনিতেই পারিলেন না বুড়ার চুল দাড়ি ভুরু কিছুই নাই।

বাহিরে আসিতেই বুড়া আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ভালো চিকিৎসার আমার দরকার নেই ডাক্তারবাবু। আপনার খারাপ ওষুধই আমাকে দিন আপনি। আপনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন, বুড়ীকে বাঁচিয়েছেন, আপনার ওষুধেই আমার চোখ ভালো হবে—"

ডাক্তারবাবু বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কী করে এলে? এ সময় তো ট্রেন নেই—"

পুত্র উত্তর দিল—"হেঁটে এসেছি। বাবা কিছুতেই থাকতে চাইলেন না। একটু ফাঁক পেতেই পালিয়ে এলাম—"

"এঁকে হাঁটিয়ে নিয়ে এলে?"

"না, বাবাকে আমি কাঁধে করে এনেছি।"

সেই সবে ডাক্তারি পাস করেছি। চিকিৎসা-শাস্ত্রে এবং নিজের নৈপুণ্যে তখন অগাধ বিশ্বাস। রোগী একটা পেলেই হয়। সাজসজ্জা ক'রে রাস্তার ধারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে উন্মুখ হয়ে বসে থাকি। বুড়ো দীনু ডাক্তারেরই যত 'কল্'—অথচ লোকটা যতদূর সেকেলে হতে হয়—অতি-আধুনিক আবিষ্কারের ধার ধারেন না কোনো। নাড়ী টিপে, জিব দেখে, পেট টিপে, অত্যন্ত অনাড়ম্বর পদ্ধতিতেই বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন, অথচ আমরা—যাক সেকথা। ওই দীনু ডাক্তারই আমাকে ডাকলেন একদিন তাঁর একটা 'কেসে'। সে 'কেসে' দু'জন নামজাদা ডাক্তার এসেছিলেন। আমাকে ডাকা হয়েছিল রাত জাগবার জন্যে। রোগীর কাছে সর্বদা একজন কৃতবিদ্য ডাক্তারের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন সবাই। রাত্রির ভারটা আমার উপর দিয়েছিলেন দীনুবাবু। সম্ভবত আমার দাদামশায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল ব'লে।

গিয়ে দেখি হৈ-হৈ ব্যাপার রৈ-রৈ কাণ্ড। আশপাশের যত নামকরা ডাক্তার সবাই সমবেত হয়েছেন। কলকাতা থেকে শুধু দু'জন ডাক্তারই নন, নার্সও এসেছেন। আমিও গিয়ে হাজির হলাম। অথচ ছেলেটির হয়েছে ম্যালেরিয়া—ম্যালিগনাণ্ট টাইপের অবশ্য—কিন্তু তবু ম্যালেরিয়ার জন্য এত ধুমধাম কেন বুঝলাম না। গ্রেন-কয়েক কুইনিন দিলেই তো চুকে যেত।

সাড়ম্বর অতি-আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা ক'রে মোটা মোটা ফি নিয়ে বড় বড় ডাক্তাররা বিদায় নিলেন। ঠিক হ'ল একজন নার্স শয্যা-পার্শ্বে মোতায়েন থাকবেন, আমি থাকব পাশের ঘরে, দরকার বুঝলে আমাকে ডাকা হবে, তা-ছাড়া দু'ঘণ্টা অন্তর নাড়ীও পরীক্ষা করতে হবে ঘড়ি ধ'রে—শ্বাস-প্রশ্বাসও গুনতে হবে। যাবার আগে দীনু ডাক্তার বলে গেলেন—"তুমি এখানে আসবার আগে, আমার সঙ্গে দেখা কোরো একবার…"

"আচ্ছা।"

রাত্রে সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে নানারকম ইনজেক্‌শনের সরঞ্জাম ব্যাগে পুরে বেরিয়ে পড়লাম। দীনু ডাক্তার বাইরের ঘরে একা বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন।

"এস, বোসো। একটা কথা বলবার জন্য তোমাকে ডেকেছি। পাল্‌স্‌ রেস্‌পিরেশন গোনা ছাড়া আর যেন কিছু করতে যেয়ো না তুমি। কোনো ইন্‌জেক্‌শন-ফিন্‌জেক্‌শন দিও না যেন—"

"পাল্‌স্‌টা যদি খারাপ হয়, একটা স্ট্রিক্‌নিন্‌ বা ক্যামফার ইন্‌ ইথার দিলে ক্ষতি কি?"

"কিছু কোরো না—বদনাম হয়ে যাবে—"

মিনিটখানেক গড়গড়া টেনে বললেন—"ও ছেলে বাঁচবে না—".

"ম্যালেরিয়া হয়েছে, কুইনিন পড়ে গেছে, না বাঁচবার কোনো কারণ দেখছি না তো—"

"কিছুতেই বাঁচবে না। এর আগে ছ'টা মরেছে। ওর ছেলে বাঁচে না—"

"ছ'টা মরেছে!"

"হ্যাঁ। এক-একটা ছেলে জন্মায়, সাত-আট বছর বেঁচে থাকে, তারপর একটা কিছু হয় আর পট ক'রে ম'রে যায়। কোনোবারই চিকিৎসার ত্রুটি হয়নি। মরে যাবার বছরখানেক পরেই আবার একটা ছেলে জন্মায়—বছর-কয়েক বাঁচে—তারপর অসুখ হয় আর ম'রে যায়। আমার হাতেই ছ'জন গেছে—এটাও যাবে। খরচ করাতে আসে খালি—"

বৃদ্ধ গম্ভীর মুখে তামাক টানতে লাগলেন।

আমার মনে হ'ল বুড়োর বোধ হয় ভীমরতি হয়েছে। ছ'জন মরেছে বলে সপ্তমকেও যে মরতে হবে—এ কি একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি হ'ল! আর কিছু যদি নাই করতে হয়, তাহলে শুধু শুধু আমাকে একশো টাকা দেবার মানে কি? আমার মনে যাই হোক, বাইরে চুপ করে রইলাম। বুড়োর সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি?

দুই

গভীর রাত্রে নার্স এসে ডাকলে।

গিয়ে দেখি খোকার বাবা—এ অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী বৃদ্ধ জগৎ সেন—বিছানার একধারে চুপ ক'রে ব'সে আছেন। তাঁর দিকে কটমট করে চেয়ে খোকা ব'লে চলেছে—"ডাক্তারের একশো টাকা আর নার্সের পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দাও না, আমি চলে যাই। কেন আর আটকে রেখেছ আমাকে, দিয়ে দাও শিগগির, আমি আর থাকতে পারছি না—শিগগির দিয়ে দাও—শিগগির দিয়ে দাও—"

বিছানা ছেড়ে ঠেলে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। দু'জনে মিলে চেপে ধরতে হ'ল তাকে।

"শিগগিব দাও—শিগগির দিয়ে দাও—"

যেন আট বছরের ছেলের কণ্ঠস্বর নয়—একজন প্রবীণ বুড়ো যেন খনখন ক'রে কথা বলছে। এ অবস্থায় হায়োসিন হাইড্রোবোম দেওয়া উচিত না মরফিন্ দেওয়া উচিত ভাবছি—এমন সময় জগৎবাবু এক কাণ্ড করে বসলেন। হঠাৎ তিনি মাটিতে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে বলে উঠলেন—"নবীনবাবু, দয়া করুন আমাকে—আমি সুদ-সমেত পাই পয়সা সব শোধ করে দিচ্ছি—আপনি যাবেন না, থাকুন, দয়া করুন আমাকে—"

"না, জোচ্চোরের বাড়ি আমি থাকি না—"

"ওরে খোকা, বাবা আমার—"

আর্তকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন জগৎবাবু।

খোকা আবার ঠেলে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল।

"শিগগির ফিস দিয়ে দাও এঁদের "

"দিচ্ছি দিচ্ছি "

আলুথালু বেশে উঠে পড়লেন জগৎবাবু। তাড়াতাড়ি 'সেফ' খুলে টাকা বার করে আমাকে আর নার্সকে দিলেন।

খোকা যেন তৃপ্ত হয়ে চোখ বুজল।

সে চোখ আর খুলল না।

গভীর রাত্রি। আকাশে জ্যোৎস্নার পাথার। একরাশি ছোট ছোট সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে একধারে। একরাশি শুভ্র চন্দ্রমল্লিকা যেন।

দ্বিতলের বাতায়নে বন্দনা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে একা। আজ তার জীবনের পরম রাত্রি। স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে। ঠিক প্রথম নয়, তবু প্রথম। বাসরঘরের ভিড়, ফুলশয্যার অস্বাভাবিকতা, সমাজের কলরব সমস্ত চুকে গেছে। আজই প্রথম প্রকৃত মিলন-রাত্রি।

নিরালা জ্যোৎস্না-যামিনী নিবিড় হ'য়ে আসছে।

চোখ গেল চোখ গেল—চোখ গেল—

ধাপে ধাপে সুর চড়িয়ে ডেকে উঠল পাখিটা। জ্যোৎস্নায় শিহরণ লাগল। খোঁপা থেকে বেলফুল প'ড়ে গেল একটা। ফুলটা হাসছে।

আকাশে ছোট ছোট মেঘগুলি রূপান্তরিত হয়েছে। চন্দ্রমল্লিকার রাশি নেই, এক জোড়া রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে পাশাপাশি। স্বপ্নলোক যেন।

স্বপ্নলোকই তো। বন্দনার স্বপ্ন সফল হয়েছে, অমন রূপবান গুণবান স্বামী তাকেই পছন্দ করেছেন। বাংলাদেশে মেয়ের অভাব ছিল না। কত রূপসী, কত বিদুষী, কত ধনীর দুলালী এসেছিল ভিড় করে। কিন্তু তার সুরের কাছে পরাভব মানতে হয়েছিল সবাইকে।

একটা সূক্ষ্ম গর্ব গোলাপী নেশার মতো সঞ্চারিত হতে লাগল তার মনে। হবে না? মনে পড়ল কী কৃচ্ছ্রসাধনই না সে করেছে! সেতার, এস্রাজ, বীণা। দিবারাত্রি গলা সাধা। তানপুরার সঙ্গে বড় বড় রাগ-রাগিণীর আলাপ। জীবনে আর তো কিছুই সে করেনি। গত ষোলো বৎসর সুরের সাধনাই করেছে কেবল একাগ্রচিত্তে। সুরের ঝরনাতলায় দেখা হ'ল স্বামীর সঙ্গে। স্বামীর অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি ফুটে উঠতে লাগল মানসপটে ধীরে ধীরে। আজ রাত্রে বাগেশ্রী আলাপ ক'রে শোনাবে সে। সেতারটা পাশের ঘরে এনে রেখেছে।

ঝন করে শব্দ হ'ল একটা। সেতারের তারটা ছিঁড়ে গেল নাকি? ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল বন্দনা। পাশের ঘরের দরজায় একটি তন্বী রূপসী দাঁড়িয়ে আছে। অপরূপ রূপসী।

"আমি চললুম।"

"কে আপনি?"

"তোমার গানের সুর। এতদিন তোমাকে নিয়ে তন্ময় হয়ে ছিলে, তাই কাছে ছিলাম। এখন তুমি আর একজনের গলায় মালা দিয়ে তারই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছ। আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি চললুম।"

বন্দনাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে বেরিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল যেন। বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল বন্দনা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে আকাশের দিখে চোখ পড়ল। হংসমিথুন নেই। স্বচ্ছবসনা একটি পরী উড়ে চলেছে যেন অজানার উদ্দেশে। ওড়নাটা উড়ছে আকাশ জুড়ে।

হঠাৎ সে চমকে উঠল। পিছনের দিক থেকে চোখ দুটো টিপে ধরছে কে! নিঃশব্দচরণে স্বামী কখন এসে প্রবেশ করেছেন সে টের পায়নি।

বারাণসীর জনবহুল পথের ধারে অন্ধ ভিখারীটি ব'সে থাকে। পোড়া-পোড়া কালো চেহারা। যেন ঝলসানো। অল্প কয়েকদিন হ'ল এসেছে। কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। এমন কি, অন্যান্য ভিখারীরাও তার সম্বন্ধে অজ্ঞ। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। রাস্তার একধারে ছেঁড়া কাপড়টি পেতে সঙ্কোচে বসে থাকে শুধু নীরবে। তবু ভিক্ষা মেলে। কাশীতে পুণ্যার্থীর ভিড়, পুণ্যসংগ্রহের জন্যেই লোকে আসে এখানে, ভিক্ষা দিতে কার্পণ্য করে না। নীরব ভিখারীটির ছঁড়া কাপড়ও ভরে ওঠে রোজ নানা জনের নানা দাক্ষিণ্যে। আধলা, পয়সা, ডবল পয়সা, আনি, দুয়ানি, সিকি, এমন কি, আধুলিও পড়ে মাঝে মাঝে। গোটা টাকাও পড়েছিল একদিন একটা। খাবারও জমে নানা রকম। ভিখারী কিন্তু বসে থাকে নীরবে। অন্ধ চোখের দৃষ্টি নির্বিকার। গভীর রাত্রে রাস্তাঘাট নির্জন হলে ধীরে ধীরে ওঠে। কাপড়ের উপর সঞ্চিত সমস্ত জিনিস পুঁটুলি করে বেঁধে লাঠি ঠুক্‌ঠুক করে গঙ্গার ঘাটে যায়—তারপর গঙ্গাগর্ভে ফেলে দিয়ে আসে সব। সে যা চায় তা পায়নি। কাপড়টি বিছিয়ে আবার বসে এসে রাস্তার ধারে। কতদিন বসে থাকতে হবে কে জানে!

দুই

সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে অনেকক্ষণ। পথ জনবিরল হয়ে এসেছে। আর একটি ভিখারীর আবির্ভাব হ'ল সেই পথে। ন্যুব্জদেহ স্থবির। গায়ে ছেঁড়া কাঁথা, পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো। মাথায় জট প'ড়ে গেছে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। এই ভিখারীটি এসে প্রথম ভিখারীর কাছে দাঁড়াল এবং নিজের ভিক্ষার থলিটি তার কাপড়ে উজাড় ক'রে ঢেলে দিলে। ঢেলে দিয়ে দাঁড়াল না। সহসা প্রথম ভিখারী পুলকিত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে অদ্ভুত রূপান্তর ঘটল তার। গায়ের রঙ টকটকে ফরসা হয়ে

গেল···মাথার চুল সোনালী। চেহারাই বদলে গেল একেবারে। উঠে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে উঠল—"আমায় ক্ষমা করে যাও মহারাজ, চলে যেয়ো না। আমি ক্ষমা চাইছি, হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি—"

ন্যুব্জদেহ ভিখারী ঘুরে দাঁড়াল।

সাহেব বলতে লাগল—"ক্ষমা করো আমাকে মহারাজ। কতদিন যে তোমার আশায় বসে আছি! অভিশপ্ত-জীবন আর বইতে পারছি না। কত রৌরবে পুড়েছি, কুম্ভীপাকে ঘুরেছি। এখন আমার উপর আদেশ হয়েছে, ভারতবর্ষে ভিখারী-জীবন যাপন কর গিয়ে। যদি কোনোদিন তার হাতে ভিক্ষা পাও তবেই তোমার রূপান্তর ঘটবে। সে যদি তোমাকে ক্ষমা করে তাহলেই তোমার মুক্তি। আমায় ক্ষমা করো মহারাজ····"

ন্যুব্জদেহ ভিখারীর মুখও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যাক, এতদিনে দেখা পাওয়া গেছে তাহলে।

"মিস্টার হেস্টিংস? তোমাকে আমিও তো খুঁজেছি জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে। তোমাকে যে আমি ক্ষমা করেছি তা তোমাকে না জানানো পর্যন্ত আমারও যে মুক্তি নেই।"

"ক্ষমা করেছ?"

"নিশ্চয়।"

দেখতে-দেখতে ন্যুব্জদেহ স্থবির ভিখারী সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হ'ল। ওয়ারেন হেস্টিংস আর মহারাজ নন্দকুমার পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

ভদ্রলোক কোথা থেকে এসেছিলেন কেউ জানত না! বাইরের কোনো ভড়ং ছিল না। জটা, গেরুয়া, প্রাণায়াম, বক্তৃতা কিছু না। তিনি যে আধ্যাত্মিক মার্গের পথিক তা কেউ সন্দেহও হয়তো করত না যদি না তিনি শহর ছেড়ে গঙ্গার ধারে পোড়ো বাড়িটাতে আশ্রয় নিতেন। প্রথম প্রথম লোকে অন্যরকমও ভেবেছিল। কেউ ভেবেছিল ফেরারী আসামী কেউ ভেবেছিল গোয়েন্দা। উর্বর মস্তিষ্কের অভাব নেই। নানাবিধ কল্পনা করেছিল লোকে। কিন্তু অনেকদিন কেটে যাবার পরও যখন চমকপ্রদ কিছু ঘটল না, তখন সবাই মানতে বাধ্য হ'ল লোকটা ভালই সম্ভবত—সাধু-সন্ন্যাসী-গোছ কিছু একটা হবে। কিন্তু লোকেদের এ ধারণাকেও তিনি প্রশ্রয় দেননি। কেউ হাত দেখাতে এলে বলতেন—আমি কিছু জানি না। দৈব ঔষধ চাইতে এলে বলতেন—জানি না। ভগবান সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে বলতেন—জানি না। উদ্ধতভাবে বলতেন না। অত্যন্ত সসঙ্কোচে মৃদুকণ্ঠে বলতেন। কৌতূহলী জনতা বার বার তাঁর কাছে গিয়ে হতাশ হয়ে নিরস্ত হয়েছিল শেষটা।

নিরস্ত হননি কেবল হারাধনবাবু। তিনি ফাঁক পেলেই যেতেন। এই অনাড়ম্বর নির্জনতাপ্রিয় নির্ঝঞ্ঝাট লোকটিকে বড় ভালো লাগত তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন। তাঁর কেবলই মনে হ'ত লোকটির মধ্যে ঐশ্বর্য আছে কোনো। কি ঐশ্বর্য আছে জানবার চেষ্টা করেননি কোনোদিন। কাছে গিয়ে বসলেই অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠত। কথাবার্তা অল্পই হ'ত। যা হ'ত তাও অতি সাধারণ। যুদ্ধের কথা, দুর্ভিক্ষের কথা —এইসব। ভগবদ্-প্রসঙ্গ একদিন উত্থাপন করেছিলেন হারাধনবাবু।

"আচ্ছা, ভগবানের সম্বন্ধে কি ধারণা আপনার—"

"কি বলব—"

একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ ক'রে রইলেন তিনি।

"আপনি কখনও কিছু দেখেননি ?"

"আমি ? আপনি যা দেখছেন আমিও তাই দেখেছি। আকাশ সমুদ্র-নদী-প্রান্তর-ফল-ফুল-সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রময় বিরাট বিচিত্র চেতনা—এর বেশী আর তো কিছু দেখি না।"

"এই তাহলে ভগবান ?"

"কি জানি।"

সসঙ্কোচে চুপ ক'রে রইলেন।

কিছুক্ষণ ব'সে থেকে হারাধনবাবু উঠে এলেন।

ফিরবার পথে নরেনবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। নরেনবাবু বিদ্বান লোক।

"কোথা গেছলেন হারাধনবাবু ?"

"গঙ্গার ধারের সেই সাধুটির কাছে।"

"কে সাধু ? সেই পোড়ো বাড়িটাতে থাকে যে লোকটা ?"

"হ্যাঁ।"

"সে সাধু কে বললে আপনাকে ! আস্ত ইডিয়ট একটা। পাছে বিদ্যে ফাঁস হয়ে যায় ব'লে পারতপক্ষে কথা বলে না। বোগাস্ !"

হারাধনবাবু মৃদু হাসলেন একটু। নরেনবাবুর সঙ্গে তর্ক করবার সামর্থ্য নেই তাঁর।

নরেনবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"তাঁর সাধুত্বের প্রমাণ পেয়েছেন কোনো ?"

"না।"

"তবে ?"

হারাধনবাবু চুপ করেই রইলেন।

এইভাবেই কাটছিল। হারাধনবাবু তবু সময় পেলেই যেতেন তাঁর কাছে। আর-সকলের কৌতূহল ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল, হারাধনবাবুরই হয়নি।

কিন্তু কিছুদিন পরে হারাধনবাবুও যাওয়া বন্ধ করলেন। অন্য কোনো কারণে নয়, তাঁর একমাত্র ছেলেটির টাইফয়েড হয়েছিল ব'লে। তারই

চিকিৎসা ব্যাপারে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে, অন্য কোনোদিকে মন দেবার অবসরই পাননি তিনি। ছেলের অসুখ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠতে চিকিৎসার কোনো ত্রুটি করেননি তিনি। সাধ্যের অতীত হ'লেও শহরের সমস্ত নামজাদা চিকিৎসকদের একত্রিত ক'রে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলেছিলেন। অসুখ কিন্তু বেড়েই চলল। দিন কাটে তো রাত কাটে না। একদিন বিকেলে ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেলেন। আশা নেই, রাত কাটবে কি না সন্দেহ। বাড়িতে কান্নার রোল উঠল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হারাধন পুত্রের মৃত্যুশয্যার শিয়রে বসে চতুর্দিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। হঠাৎ সেই সাধুটির কথা মনে পড়ল। আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

রাত তখন অনেক হয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ মেঘের স্তর ভেদ করে সবে উঠেছে। গঙ্গার জল কূলে কূলে ভরা। হাওয়া উঠেছে একটা। কল-কল ধ্বনিতে গঙ্গাতীর মুখরিত। হন্তদন্ত হারাধন পোড়ো বাড়িটাতে এসে হাজির হলেন। দেখলেন, সাধুটি জেগেই আছেন। গঙ্গার ধারটিতে চুপ করে বসে আছেন তন্ময় হয়ে।

"আমার ছেলেকে বাঁচান আপনি –"

তাঁর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লেন হারাধনবাবু।

"কে, হারাধনবাবু! ওকি – উঠুন – উঠুন – কি হয়েছে কি?

সব শুনলেন। শুনে বললেন – "আমি কি করব বলুন – আমার কি ক্ষমতা আছে –"

হারাধনবাবু অবুঝের মতো কাঁদতে লাগলেন।

"দয়া করুন, দয়া করুন, আমার একমাত্র ছেলে –"

সাধু চুপ করে রইলেন।

"বাঁচবার কোনো উপায় নেই? কোনো আশাই নেই?"

"তার আয়ু যদি নিঃশেষ হয়ে থাকে –" এই পর্যন্ত ব'লে আবার নীরব হলেন তিনি।

হারাধনবাবু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

"আমার একমাত্র ছেলে। কিছু একটা করুন আপনি। ইচ্ছে করলেই

আপনি পারেন। সত্যি কোনো উপায় নেই—নিশ্চয়ই আছে কিছু—দয়া করুন আপনি—”

'কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাধু বললেন—“শুনেছি অপরে কেউ যদি নিজের আয়ু দান করে তাহলে নাকি আয়ুহীন লোক বাঁচতে পারে কিছুদিন, কিন্তু তা কি করে সম্ভব?”

“আপনি ইচ্ছে করলে সব পারেন—দয়া করুন।”

সাধুর পায়ে ধ'রে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন হারাধনবাবু।

বিব্রত সাধু নিজের পা সরিয়ে নিয়ে অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, “ভগবানকে ডাকুন, তিনি যদি দয়া করেন, সব হতে পারে। তিনিই একমাত্র ভরসা, তাঁকেই ডাকুন। আমরা কে—”

অনেক ক'রে বুঝিয়ে হারাধনবাবুকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

হারাধনবাবু বাড়ি ফিরে দেখলেন, ছেলের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দেখে বিস্মিত হলেন—নাড়ির অবস্থা ফিরেছে, আর ভয় নেই। ক্রমশ ভালোর দিকে যেতে লাগল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মেঘ যখন কাটতে শুরু করে তখন যেমন দেখতে-দেখতে সব পরিষ্কার হ'য়ে যায়, হারাধনবাবুর ছেলের অবস্থা তেমনি দেখতে-দেখতে ভালো হ'য়ে উঠল। পরদিন বেলা দশটা নাগাদ ডাক্তারেরা বললেন—“আর ভয় নেই, টালটা সামলে গেছে। এ যাত্রা বেঁচে যাবে বলেই মনে হচ্ছে।”

উল্লসিত হারাধনবাবু সাধুটিকে খবর দিতে ছুটলেন। সেখানে পৌঁছে কাউকে দেখতে পেলেন না। ডাকলেন—সাড়া পেলেন না। ভিতরে ঢুকে দেখলেন, আপাদ-মস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। আবার ডাকলেন, উত্তর পেলেন না। ঠেললেন—তবু সাড়া নেই। গায়ের চাদরটা সরিয়ে চমকে উঠলেন। প্রাণহীন মৃতদেহটা পড়ে আছে শুধু—মুখে অদ্ভুত একটা প্রশান্ত হাসি।

অন্ধকারে একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম মাঠে। সে-ও সঙ্গে ছিল। তার অঙ্গ-সৌরভ, বলয়-নিক্কণ, নিশ্বাসের মৃদু শব্দ সমস্তই অনুভব করছিলাম। পাশাপাশি ছিল, অতিশয় কাছাকাছি। মুখে কথা ছিল না। আমারও না, তারও না। আলাপ বন্ধ ছিল না তবু। দু'জনেই কথা কইছিলাম। কিন্তু নীরবে। তার সমস্ত অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল আমার কল্পনায়। তাই যখন নীরব ভাষায় সে আমাকে প্রশ্ন করলে—"আমাকে তুমি তো কখনও দেখনি, তবু চাইছ কেন এত করে?"

তখন আমি সসঙ্কোচে উত্তর দিলাম—"তোমাকে আমি জানি।"

"কি ক'রে জানলে?"

"কি ক'রে তা জানি না, কিন্তু জানি!"

নিবিড়তর হয়ে উঠল অন্ধকার।

পাশাপাশি হাঁটলাম অনেকক্ষণ···কতক্ষণ মনে নেই। মনে হচ্ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে।····সহসা তার একটা নীরব প্রশ্ন সঞ্চারিত হ'ল আমার মনে।

"এত ক'রে চাইছ যদি নিচ্ছ না কেন?"

"ধরা দিলে কই?"

মদিরতর হয়ে উঠল তার অঙ্গ-সৌরভ।

মনে হ'ল তার চকিত দৃষ্টির চাহনি বিদ্যুতের মতো চিরে চ'লে গেল অন্ধকারকে। চতুর্দিক বিদ্যুতায়িত হ'য়ে উঠল ক্ষণকালের জন্য।

"সর্বদা ধ'রে রেখেছ, তবু বলছ ধরা দিইনি!"

"আমি যেখানে চাই সেখানে দাওনি।"

"কোথায় চাও?"

"ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকে।"

দ্রুততর হ'য়ে উঠল তার নিশ্বাস। স্পন্দিত হ'য়ে উঠল অন্ধকার···মনে

হ'ল খুব কাছে স'রে এসেছে....তার চোখের জল গালে পড়ল আমার · এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল·· বরফের মতো ঠাণ্ডা....

সহসা সচেতন হলাম, বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ির দিকে ফিরলাম। সে-ও চলেছে। মুষলধারা নামল। ছুটছি....সে-ও ছুটছে সঙ্গে সঙ্গে। সহসা অতিশয় কাছে এসে পড়ল যেন....তার ভিজে শাড়ির স্পর্শ পেলাম মনে হ'ল।....পাশাপাশি ছুটে চলেছি। নির্জন পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হলাম নীরবে। —তারপর সুদীর্ঘ গলিটা। নীরন্ধ্র অন্ধকার। গলির শেষে আমার প্রকাণ্ড নির্জন বাড়িটা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এখনই গ্রাস করবে আমাকে। দ্রুতপদে বারান্দায় উঠলাম। সে-ও উঠল। ঘরে ঢুকলাম, সে-ও ঢুকল। সুইচ্ টিপলাম তাড়াতাড়ি—তীব্র আলোয় ভ'রে উঠল চতুর্দিক। দেখি, কেউ নেই।

নীল-শেড-দেওয়া ইলেকট্রিক বাতিটার উপর কয়েকদিন থেকে একটি প্রজাপতি এসে বসছে। যতক্ষণ আমি টেবিলে ব'সে লেখা-পড়া করি, ও শেডটির উপরে চুপ ক'রে ব'সে থাকে। আশা মারা যাবার কিছুদিন পর থেকে ও-ই আমার সন্ধ্যাবেলার সঙ্গী হয়েছে।

বন্ধু সোমেশ্বর এসে প্রবেশ করলে। ইদানীং প্রায় আসছে। ওকে দেখলেই আমার ভয় করে। ওর বোন বেলার সম্বন্ধে আজকাল যে একটু দুর্বলতা পোষণ করছি, সেটা ও টের পেয়ে গেছে। বেকায়দায় প'ড়ে গেছি। সোমেশ্বর এসেই কাজের কথা পাড়লে একেবারে।

"বেলার সম্বন্ধে কি ঠিক করলে?"

চুপ ক'রে রইলাম।

"যা হোক একটা ঠিক করে ফেল ভাই"—তারপর একটু থেমে বললে—"শেষ পর্যন্ত বিয়ে তো করবেই, সবাই করে, বেলাকে যদি কর আমি নিশ্চিন্ত হই। বেলা তোমাকে ভালোও বাসে—"

সবই ঠিক—তবু চুপ করে রইলাম। আশা যখন বেঁচে ছিল তখন তাকে বলেছিলাম যে, আর কখনও বিয়ে করব না—এখন বুঝতে পারছি বিয়ে করতে হবে--বেলাকেই করতে হবে—কিন্তু দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠতে পারছি না কিছুতেই।

"চুপ ক'রে আছ কেন? তোমার সত্যি যদি মত না থাকে আমি জোর করতে চাই না। খুলে বলো সেটা। তাহলে দ্বিজেনের সঙ্গে চেষ্টা করি। তুমি রাজী হ'লে অবশ্য আর কোথাও যাব না আমি। দ্বিজেনের ভাবভঙ্গী থেকে মনে হয় সে আপত্তি করবে না, তবে...."

ওই খোঁচা-গোঁফ-ওলা দ্বিজেন বেলাকে বিয়ে করবে!

ওর সে মতলব আছে না কি?

বললাম—"দ্বিজেনের কাছে যাবার দরকার নেই। আমিই বিয়ে করব। তবে কিছুদিন সময় দাও ভাই।"

"তুমি কথা দিলে অপেক্ষা করতে পারি।"

চুপ করে রইলাম।

"কথা দিচ্ছ তো?"

"দিচ্ছি।"

"বেশ। বেলাকে সুখবরটা দিয়ে আসি তাহলে।"

সোমেশ্বর চলে গেল।

এরপর যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য।

হঠাৎ আশার কণ্ঠস্বরে কে যেন ব'লে উঠল, "তাহলে আমার দায়িত্বও ফুরোল—আমিও চললাম।"

প্রজাপতিটা উড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

একমুখ-গোঁফ-দাড়িওয়ালা লোক—মাথায় বাবরি চুল, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—চোখ দুটোতে অস্বাভাবিক রকম প্রখর দীপ্তি। হঠাৎ দেখলে কাপালিক ব'লে সন্দেহ হয়। সাইকেল চ'ড়ে রোজ আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যায়—মাড়োয়ারীর তেলকলের কেরানী।

২

শ্মশানে একদিন দেখেছি তাকে। মড়া পোড়াতে গিয়েছিলাম, দেখি লোকটি দূরে দূরে, অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে একা-একা। আমাদের দেখে সরে গেল।

৩

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। 'লু' বইছে। পাশের যোগেনবাবুর বাড়ির বাইরের ঘর থেকে নারীকণ্ঠের চাপা কান্না কানে এল। গিয়ে দেখি, যোগেনবাবুর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে এক মলিনসনা বধূ। রূপ নেই—স্বাস্থ্য নেই—অশ্রু ছাড়া আর কিছু নেই।

যোগেনবাবু দয়ালু লোক।

মেয়েটিকে পাঁচটি টাকা দিয়ে বললেন—আচ্ছা, শিবুকে আমি ধমকে দেব। রাতদুপুরে শ্মশানে যায় কেন?

শুনলাম শিবু সেই লোকটির নাম—সেই তেলকলের কেরানী।

৪

তন্ত্রের একটা বই হাতে এল।

পড়ে দেখলাম, সাধনা করলে নাকি অদৃশ্যলোক থেকে ভামরা ঝামরী ডামরী নানা দেবদেবী ডাকিনী-যোগিনী দেখা দেন অদৃশ্যলোকের অপরূপ

ঐশ্বর্য নিয়ে। সিদ্ধি হয় সাধনার অনুরূপ। যে যে-কামনা নিয়ে সাধনা করে, সে সেইরূপে নাকি পায়। প্রিয়া-রূপেও নাকি পাওয়া যায়- যদি সাধনার জোর থাকে।

৫

যদি জেরা করেন সদুত্তর দিতে পারব না।

মনে কিন্তু গল্প জাগে।

দিনের আলোয় দৃশ্যমান জগতে শিবু তেলকলের সামান্য কেরানী, কুৎসিত হাড়পাঁজরা-বার-করা স্ত্রীর স্বামী, একপাল রুগ্ণ ছেলেমেয়ের পিতা, অধিকাংশ লোকেই গ্রাহ্য করে না তাকে, গাল দেয় অনেকে। দিনের আলোয় সে নগণ্য। শ্মশান-সাধনায় কিন্তু সে উত্তীর্ণ হয়েছে। রাতের অন্ধকারে তার কাছে অদৃশ্যলোক থেকে নেমে আসে পদ্মিনী, গলায় পরিয়ে দেয় বরমালা।

রাতদুপুরে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, খোলা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নালোকিত নীল আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, শুভ্র একখণ্ড লঘু মেঘ ছায়াপথের পাশ দিয়ে অলস মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে রেবতী নক্ষত্রের দিকে। ঝাউবনের মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

সহসা মনে হ'ল—সে আসেনি। আসতে পারত কিন্তু আসেনি।

উঠে বসলাম বিছানায়। দূর চক্রবালরেখালগ্ন পর্বতশ্রেণী রহস্যময় হয়ে উঠেছে স্বপ্নপুরীর মোহ-মহিমার--অব্যক্তের ইঙ্গিত যেন উঁকি দিচ্ছে দৃষ্টি-সীমানার ওপার থেকে।

ধীরে ধীরে বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

একি!

দিনের বেলা যে তালগাছ দুটোকে প্রান্তরের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি—তারা কাছাকাছি সরে এসেছে-- একজন আর-একজনের কানে কী যেন বলছে চুপিচুপি।

সহসা তারা যেন টের পেয়ে গেল আমি দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে স'রে গেল তারা প্রান্তরের দুই প্রান্তে, দুষ্টু ছেলের মতো। ডেকে উঠল একটা নাম-না-জানা পাখি যেন হেসে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ ক'রে।

সমস্তটা দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে একটা চখার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম। যাঁরা কখনও এ কার্য করেননি, তাঁরা বুঝতে পারবেন না হয়তো ব্যাপারটা ঠিক কী জাতীয়। ধু ধু করছে বিরাট বালির চর, মাঝে মাঝে ঝাউগাছের ঝোপ, একধার দিয়ে শীতের শীর্ণ গঙ্গা বইছে। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। হু-হু করে তীক্ষ্ণ হাওয়া বইছে একটা। কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে প্রায় ক্রোশ দুই বালির চড়া ভেঙে আমি এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম সকালবেলা। সমস্ত দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বালির চড়া ভেঙে ভেঙে কতখানি যে হেঁটেছি, খেয়াঘাট থেকে কতদূরেই বা চ'লে এসেছি তা খেয়াল ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল সারাজীবন ধরে যেন হাঁটছিল, অবিশ্রান্ত হেঁটে চলেছি, চতুর চখাটা কিছুতেই আমার বন্দুকের আয়ত্তের মধ্যে আসছে না, ক্রমাগত এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে পালাচ্ছে।

আমি এ অঞ্চলে আগন্তুক। এসেছি ছুটিতে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে। আমি নেশাখোর লোক। একটি আধটি নয়, তিনটি নেশা আছে আমার। ভ্রমণ, সঙ্গীত এবং শিকার। এখানে যেই এসে শুনলাম খেয়াঘাট পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই গঙ্গায় পাখি পাওয়া যাবে, লোভ সামলাতে পারলাম না, বন্দুক কাঁধে করে বেরিয়ে পড়লাম। লোভ শুনে মনে করবেন না যে আমি মাংস খাবার লোভেই পাখি মারতে বেরিয়েছি। তা নয়। আমি নিরামিষাশী। আলুভাতে-ভাত পেলেই আমি সন্তুষ্ট।

খেয়াঘাট পেরিয়ে সকালে চরে এসে প্রথম যখন পৌঁছলাম, তখন হতাশ হয়ে পড়তে হ'ল আমাকে। কোথায় পাখি! ধু ধু করছে বালির চড়া — আর কোথাও কিছু নেই। গঙ্গার বুকে দু-একটা উড়ন্ত মাছরাঙা ছাড়া পাখি কোথায়! বন্দুক কাঁধে করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় কাঁআঁ শব্দটা কানে এল। কয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার আর অয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার দিয়ে যে

শব্দটা হয়, চখার ডাকটা ঠিক সে রকম নয়, তবে অনেকটা কাছাকাছি বটে। কাঁআঁ শুনেই বুঝলুম চখা আছে কোথাও কাছেপিঠে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি, হ্যাঁ ঠিক, চখাই বটে—কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম মাত্র একটি দেখে। চখারা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় থাকে; বুঝলাম দম্পতির একটিকে কোনো শিকারী আগেই শেষ করে গেছেন। এটির ভব-যন্ত্রণা আমাকেই ঘোচাতে হবে। সাবধানে এগুতে লাগলাম।

কাঁআঁ—

চখা উড়ে গেল। উড়বে জানতাম; চখা মারা সহজ নয়। দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে আরও খানিকটা দূরে গিয়ে বসল। বেশ খানিকটা দূরে আমি আবার সাবধানে এগুতে লাগলাম। কাছাকাছি এসেছি, বন্দুকটি বাগিয়ে বসতে যাব আর অমনি কাঁআঁ—

উড়ে গেল। বিরক্ত হলে চলবে না, চখা শিকার করতে ধৈর্য চাই। এবার চখাটা একটু কাছেই বসল। আমিও বসলাম। উপর্যুপরি তাড়া করা ঠিক নয়—একটু পরেই উঠলাম আবার। আবার ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম, কিন্তু উলটো দিকে। পাখিটা মনে করুক যে আমি তার আশা ছেড়ে দিয়েই চলে যাচ্ছি যেন। কিছুদূর গিয়ে ওধার দিয়ে ঘুরে তারপর বিপরীত দিক দিয়ে কাছে আসা যাবে। বেশ কিছু দূর ঘুরতে হ'ল—প্রায় মাইলখানেক। গুঁড়ি মেরে মেরে খুব কাছেও এসে পড়লাম। কিন্তু তাক্ করে ঘোড়াটি যেই টিপতে যাব আর অমনি—কাঁআঁ—

ফের উড়ল। উড়তেই লাগল অনেকক্ষণ ধ'রে। কিছুতেই আর বসে না। অনেকক্ষণ পরে বসল যদি, কিন্তু এমন একটা বেখাপ্পা জায়গায় বসল যে সেখানে যাওয়া মুশকিল। যাওয়া যায়, কিন্তু গেলেই দেখতে পাবে। আমার কেমন রোখ চড়ে গেল, মারতেই হবে পাখিটাকে। সোজা এগিয়ে চললাম। আমি ভেবেছিলাম একটু এগুলেই উড়বে, কিন্তু উড়ল না। যতক্ষণ না কাছাকাছি হলাম, ঠায় বসে রইল। মনে হ'ল অসম্ভব বুঝি সম্ভব হয়; কিন্তু যে-ই বন্দুকটি তুলেছি আর অমনি—কাঁআঁ।

এবারেও এমন জায়গায় বসল, যার কাছে-পিঠে কোনো আড়াল-আড়াল নেই—চতুর্দিকে ফাঁকা। কিছুতেই বন্দুকের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে

না। বাধ্য হয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিতে হ'ল। এবার গিয়ে বেশ ভালো জায়গায় বসল। একটা ঝাউবনের আড়ালে-আড়ালে গিয়ে খুব কাছাকাছিও আসতে পারলাম—এত কাছাকাছি যে তার পালকগুলো পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল—ফায়ার করলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লাগল না। ঝোপে ঝোপে যা দু-একটা ছোট পাখি ছিল তারাও উড়ল, মাছরাঙাগুলোও চেঁচাতে শুরু করে দিলে। সমস্ত ব্যাপারটা থিতুতে আধঘণ্টারও ওপর লাগল। নদীর ঠিক বাঁকের মুখটাতেই বসল চখাটা আবার গিয়ে।

আমি বসেছিলুম একটা বালুর ঢিপির উপর, মুশকিল হ'ল—উঠে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে। উঠলাম না। শুয়ে পড়ে গিরগিটির মতো বুকে হেঁটে-হেঁটে এগুতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর গেছি, আর অমনি কাঁআঁ—

আমার মাথাটাই দেখা গেল, না, বালির স্তর দিয়ে কোনোরকম স্পন্দনই গিয়ে পৌঁছল তার কাছে তা বলতে পারি না। উঠে দাঁড়ালাম। রোখ আরও চড়ল।

হঠাৎ নজর পড়ল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নদীর জল রক্ত-রাঙা। পাখিটা ওপারের চরে গিয়ে বসেছে। সমস্ত দিন আমিও ওকে বিশ্রাম দিইনি—ও-ও আমাকে দেয়নি। এখন দু'জনে দু-পারে। চুপ করে বসে রইলাম।

সূর্য ডুবে গেল। অস্তমান সূর্যকিরণে গঙ্গায় জলটা যত জ্বলন্ত লাল দেখাচ্ছিল, ডুবে যাওয়াতে ততটা আর রইল না। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল চতুর্দিকে। সমস্ত অন্তরেও কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বৈরাগ্য জেগে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। পূরবী রাগিণী যেন মূর্ত হ'য়ে উঠল আকাশে, বাতাসে, নদীতরঙ্গে। হঠাৎ মনে পড়ল—বাড়ি ফিরতে হবে।

কত রাত হয়েছে জানি না।

ঘুরে বেড়াচ্ছি গঙ্গার চরে চরে। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। মধ্যগগনে পূর্ণিমার চাঁদ—চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে শেষে বসলাম একটা উঁচু জায়গা দেখে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম। এমন একা জীবনে আর কখনও পড়িনি। প্রথম প্রথম একটু ভয় করছিল

যদিও, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ভয়ের বদলে মোহ এসে আমার সমস্ত প্রাণ-সত্তা অধিকার করে বসল। আমি মুগ্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম। মুগ্ধ হ'য়ে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। মনে হ'ল কত জায়গায় কত-ভাবে ঘুরেছি, প্রকৃতির এমন রূপ তো আর কখনও চোখে পড়েনি। রূপ নিশ্চয়ই ছিল, আমার চোখে পড়েনি। নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মনে হতে লাগল। তারপর সহসা মনে হ'ল আজীবন সব দিক দিয়েই আমি বঞ্চিত। জীবনের কোনো সাধটাই কি পুরোপুরি পূর্ণ হয়েছে? জীবনের তিনটি শখ ছিল—ভ্রমণ, সঙ্গীত, শিকার। ভ্রমণ করেছি বটে—ট্রেনে স্টীমারে চেপে এখানে ওখানে গেছি, কিন্তু তাকে ভ্রমণ বলে? হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায়, সাহারার দিগন্তপ্রসারিত অনিশ্চয়তায়, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে, হিমশীতল মেরুপ্রদেশের ভাসমান তুষারপর্বতশৃঙ্গে যদি না ভ্রমণ করতে পারলাম, তাহলে আর কি হ'ল! সঙ্গীতেও ব্যর্থকাম হয়েছি। সা রে গা মা সেধেছি বটে; কিন্তু সঙ্গীতের আসল রূপটি আলেয়ার মতো চিরকালই এড়িয়ে গেছে আমাকে। সেদিন অত চেষ্টা করেও বাগেশ্রীর করুণগম্ভীর রূপটি কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না সেতারে!

ঠিক ঘাটে ঠিকভাবেই আঙুল পড়ছিল; কিন্তু সেই সুরটি ফুটল না যাতে আত্মসম্মানী গম্ভীর লোকের নির্জন-রোদনের অবাঙ্‌ময় বেদনা মূর্ত হয়। শিকারই বা কি এমন করেছি? সিংহ হাতি বাঘ গণ্ডার কিছুই মারিনি। মেরেছি পাখি আর হরিণ। আজ তো সামান্য একটা চখার কাছেই হার মানতে হ'ল।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

চমকে উঠলাম। ঠিক মাথার উপর চখাটা চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখিরা সাধারণত রাত্রে তো ওড়ে না—হয়তো ভয় পেয়েছে কোনোরকমে। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

আরও খানিকটা নেমে এল।

হঠাৎ বন্দুকটা তুলে ফায়ার করে দিলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লেগেছে ঠিক। পাখিটি ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল মাঝগঙ্গায়। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম—দেখলাম ভেসে যাচ্ছে।

যাক। জীবনে যা বরাবর হয়েছে এবারও তাই হ'ল। পেয়েও পেলাম না। সত্যি, জীবনে কখনও কিছু পাইনি, নাগালের মধ্যে এসেও সব ফসকে গেছে।

চুপ করে বসে ছিলাম।

চতুর্দিকে ধু ধু করছে বালি, গঙ্গায় কুলুধ্বনি অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। শিকার, চখা, বন্দুক, সমস্ত দিনের শ্রান্তি কোনো কিছুর কথাই মনে হচ্ছিল না তখন, একটা নীরব সুরের সাগরে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। দীর্ঘকায় ঋজুদেহ এক ব্যক্তি নদী থেকে উঠে ঠিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে গামছা দিয়ে গা মুছতে লাগলেন। অবাক হয়ে গেলাম। কোথা থেকে এলেন ইনি, কখনই বা নদীতে নামলেন, কিছুই দেখতে পাইনি!

একটু ইতস্ততের পর জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি কে?"

লোকটি এতক্ষণ লক্ষ্যই করেননি।

আমার কথায় মন্ত্রোচ্চারণ থেমে গেল, ফিরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল—তারপর বললেন—"আমি এখানেই থাকি। আপনি আগন্তুক, আপনিই পরিচয় দিন।"

পরিচয় দিলাম।

"ও, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন আপনি? আসুন আমার সঙ্গে—কাছেই আমার আস্তানা।"

দীর্ঘকায় ঋজুদেহ পুরুষটি অগ্রগামী হলেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। একটু দূরে গিয়েই দেখি একটি ছোট্ট কুটীর। আশ্চর্য হয়ে গেলাম, সমস্ত দিন এ-অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি, এটা চোখে পড়েনি আমার। ছোট্ট কুটীরটি যেন ছবির মতন—সামনে পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ—চতুর্দিকে রজনীগন্ধা গাছ—অজস্র ফুল। অনাবিল জ্যোৎস্নায় ধরণীর অন্তরের আনন্দ সহসা যেন পুষ্পায়িত হয়ে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধা ঊর্ধ্বমুখী বিকাশে। মৃদু সৌরভে চতুর্দিক আচ্ছন্ন। আমিও আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি এসেই

ঘরের ভিতর ঢুকেছিলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন এবং শতরঞ্জি গোছের কী একটা পাততে লাগলেন।

"বসুন।"

বসে দেখলাম শতরঞ্জি নয়—গালিচা। খুব দামী নরম গালিচা। তিনিও একপ্রান্তে এসে বসলেন। বলা বাহুল্য, আমার কৌতূহল ক্রমশই বাড়ছিল। তবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম, তিনিও চুপ করে রইলেন। শেষে আমাকেই কথা কইতে হ'ল।

"সমস্ত দিন এ অঞ্চলে ঘুরছি কিন্তু আপনার দেখা পাইনি কেন ভেবে আশ্চর্য লাগছে।"

"সব সময় সব জিনিস কি দেখা যায়?"

মুখের দিকে চেয়ে ভয় হ'ল—চোখ দুটো জ্বলছে—মানুষের নয়, যেন বাঘের চোখ।

"একটা গল্প শুনুন তাহলে। রাজা রামপ্রতাপ রায়ের নাম শুনেছেন?"

"না।"

"শোনবার কথাও নয়। দু'জন রামপ্রতাপ ছিল—দু'জনেই জমিদার—একজন সুদ-খোর আর একজন সুর-খোর।"

"সুর-খোর?"

"হ্যাঁ—ওরকম সুর-পাগল লোক ও অঞ্চলে আর ছিল না। যত বিখ্যাত ওস্তাদের আড্ডা ছিল তাঁর বাড়িতে। আমার অবশ্য এসব শোনা কথা। আমার পাঞ্জাবে জন্ম, পাঞ্জাবী ওস্তাদের কাছেই গানবাজনা শিখেছিলুম। বাংলাদেশে এসে শুনলুম, রামপ্রতাপ নামে নাকি একজন গুণী জমিদার আছেন যিনি সুরের প্রকৃত সমঝদার। প্রকৃত গুণীকে কখনও ব্যর্থমনোরথ হতে হয়নি তাঁর কাছে—গাড়িতে একজনের মুখে কথায়-কথায় শুনলুম। তখনই যদি তাঁকে ঠিকানাটাও জিগ্যেস করি তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়—কিন্তু তা না করে আমি সপ্তাহখানেক পরে আর-একজনকে জিগ্যেস করলুম—রাজা রামপ্রতাপ রায় কোথায় থাকেন। তিনি বলে দিলেন সুদ-খোর রামপ্রতাপের ঠিকানা। ডানকুনি স্টেশনে নেমে দশ মাইল হাঁটলে তবে নাকি তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে। একদিন বেরিয়ে পড়লাম তাঁর উদ্দেশে।

ডানকুনি স্টেশনে যখন নামলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। সেদিনও পূর্ণিমা। স্টেশনে নেমে আর একজনকে জিগ্যেস করলাম। সুদ-খোর রামপ্রতাপ ও অঞ্চলে প্রসিদ্ধ লোক, সবাই চেনে। যাকে জিগ্যেস করলুম সে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে—সোজা চলে যান। চলতে লাগলাম। কতক্ষণ চলেছিলাম তা ঠিক বলতে পারি না। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম একটা বিরাট প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে হাঁটছি—চারদিকে কেবল মাঠ আর মাঠ—আর কোথাও কিচ্ছু নেই। মনে হ'ল যেন শেষ নেই।

"কিছুদূরে গিয়েই হঠাৎ সামনে প্রকাণ্ড রাজবাড়িটা দেখা গেল, যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হ'ল—সাদা ধবধব করছে, মনে হ'ল—যেন মর্মর পাথর দিয়ে তৈরী। মিনার, মিনারেট, গম্বুজ, সিংহদ্বার সমস্ত দেখা গেল ক্রমশ। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর এগিয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের দু'পাশে দেখি দু'জন বিরাটকায় দরোয়ান বসে আছে—দু'জনেই নিবিষ্টচিত্তে গোঁফ পাকাচ্ছে ব'সে। ভিতরে ঢুকব কি না জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কোনো উত্তরই দিলে না, গোঁফই পাকাতে লাগল। একটু ইতস্তত করে শেষে ঢুকে পড়লাম, তারা বাধা দিলে না। ভিতরে ঢুকে দেখি—বিরাট ব্যাপার, বিশাল জমিদারবাড়ি জমজম করছে, প্রকাণ্ড কাছারি-বাড়িতে বসে আছে সারি সারি গোমস্তারা। কেউ লিখছে, কেউ টাকা গুনছে, কেউ কেউ কানে কলম গুঁজে খাতার দিকে চেয়ে ব'সে আছে—সবারই গম্ভীর মুখ। সামনের চত্বরে বসে আছে অসংখ্য প্রজা সারি সারি। সবাই কিন্তু চুপচাপ, কারো মুখে টু শব্দটি নেই। আমি তানপুরা ঘাড়ে ক'রে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইলে না, আমারও সাহস হ'ল না কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে। আমি ঘুরেই বেড়াতে লাগলাম। আমার মনের ইচ্ছে রাজা রামপ্রতাপকে গান শোনাব, কিন্তু—হঠাৎ দেখতে পেলাম কিছুদূরে ছোট্ট একটা বাগান রয়েছে—বাগানের মধ্যে ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরের উঁচু চৌতারা আর সেই চৌতারার উপরে কে একজন ধবধবে সাদা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে প্রকাণ্ড একটা গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। গড়গড়ায় কুণ্ডলী-পাকানো নলের জরিগুলো জ্যোৎস্নায় চকমক করছে। বাগানে ছোট একটা গেট, গেটের

দু'ধারে উর্দি-চাপরাশ-পরা দু'জন দরোয়ান দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক যেন পাথরের প্রতিমূর্তি। কেমন করে জানি না, আমার দৃঢ় ধারণা হ'ল ইনিই রাজা রামপ্রতাপ। এগিয়ে গেলাম। দরোয়ান দু'জন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাধা দিল না। রাজা রামপ্রতাপের কাছাকাছি এসে ঝুঁকে প্রণাম করলাম একবার।

"তিনি গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়লেন একবার শুধু। আস্তে আস্তে বললাম—হুজুরকে গান শোনাব বলে এসেছি, যদি হুকুম করেন—

"তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন, হাতের ইঙ্গিতে আমাকেও বসতে বললেন। তারপর কখন যে আমি দরবারী কানাড়ায় আলাপ শুরু করেছি আর কতক্ষণ ধ'রে যে সে-আলাপ চলেছে তা আমার কিছুই মনে নেই। যখন হুঁশ হ'ল তখন দেখি, এক ছড়া মুক্তোর মালা তিনি আমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। মালাটা দেখবেন?" কুটীরের ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি, পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এলেন এক ছড়া মুক্তোর মালা নিয়ে। অমন সুন্দর এবং অত বড় বড় মুক্তো আমি আর দেখিনি কখনও।

"তারপর?"

"আমাকে মালা পরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। আমি চুপ করে বসেই রইলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, কিছু মনে নেই। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি রাজবাড়ি, কাছারি, চৌতারা, লোকজন —কোথাও কিছু নেই - ফাঁকা মাঠের মাঝখানে আমি একা শুয়ে ঘুমুচ্ছি।

"একা? কি রকম?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একা · কেউ নেই পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, গুণী রাজা রামপ্রতাপ অনেকদিন হ'ল মারা গেছেন। বেঁচে আছে সেই সুদ-খোর ব্যাটা। তার বাড়ির পথই সবাই আমাকে বলে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মনের একান্ত ইচ্ছে ছিল গুণী রামপ্রতাপকে গান শোনাবার, তাই তিনি মাঠের মাঝখানে আমাকে দেখা দিয়ে আমার গান শুনে বকশিশ দিয়ে গেলেন।"

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইলাম। কতক্ষণ তা মনে নেই। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"গান শুনবেন?"

"যদি আপনার অসুবিধে না হয়—"

"অসুবিধে আবার কি? সুরের সাধনা করবার জন্যেই আমি এই নির্জনবাস করছি—"

আবার উঠে গেলেন। কুটীরের ভিতর থেকে বিরাট এক তানপুরা বার করে বললেন—"বাগেশ্রী আলাপ করি, শুনুন।"

শুরু হয়ে গেল বাগেশ্রী। ওরকম বাগেশ্রীর আলাপ আমি কখনও শুনিনি। যা নিজে আমি কখনও আয়ত্ত করতে পারিনি কিন্তু আয়ত্ত করতে চেয়েছিলাম তাই যেন শুনলাম আজ। কতক্ষণ শুনেছিলাম মনে নেই, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা-ও জানি না, ঘুম ভাঙল যখন তখন দেখি আমি সেই ধু ধু বালির চড়ায় একা শুয়ে আছি, কোথাও কেউ নেই। উঠে বসলাম। উঠতেই নজরে পড়ল চখাটা চরে বেড়াচ্ছে, মরেনি।

আমরা তিনজনেই সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের গল্পটা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিলাম। শিকার উপলক্ষ্যেই আমরা এ অঞ্চলে আসিয়া সন্ধ্যাবেলা এই ডাকবাংলোয় আশ্রয় লইয়াছি। পাশের ঘরেই ভদ্রলোক ছিলেন। আলাপ হইলে আমরা শিকারী শুনিয়া তিনি নিজের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় গল্পটি আমাদের বলিলেন। অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই বটে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তারপর?"

"তারপর আর কিছু নেই। রাত হয়েছে, এবার শুতে যান, আপনাদের তো আবার খুব ভোরেই উঠতে হবে। আমারও ঘুম পাচ্ছে—"

এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ আমার কৌতূহল হইল কোন্ অঞ্চলের গঙ্গার চরে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল জানিতে পারিলে আমরাও একবার জায়গাটা দেখিয়া আসিতাম। জিজ্ঞাসা করিবার জন্য পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরে কেহ নাই। চতুর্দিকে দেখিলাম, কেহ নাই।

ডাকবাংলার চাপরাশিকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিলাম, পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি কোথাকার লোক? চাপরাশি উত্তর দিল, পাশের ঘরে তো কোনো লোক নাই, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এখানে আর কেহ আসে নাই। এ ডাকবাংলায় কেহ বড় একটা আসিতে চায় না—বলিয়া সে অদ্ভুত একটা হাসি হাসিল।

যেমন বিশাল বলিষ্ঠ চেহারা তেমনি পরিশ্রমী। কাঠ চেলাচ্ছে তো চেলাচ্ছেই—একটা গাছই কেটে সাফ করে দিলে। মাটি কোপাতে দাও, কুপিয়েই যাচ্ছে—শ্রান্তি ক্লান্তি নেই। প্রথম যৌবনে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে কার মাথায় যেন লাঠি মেরেছিল, লোকটা সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ভাগ্যে মরেনি, তাই ত্ব'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ ক'রে গোবর্ধন ছাড়া পেয়ে গেল। জেলে যখন ছিল, তখন জেলার একবার নাকি তাকে হুকুম দিয়েছিল—বাগানটা সাফ করে দাও। গোবর্ধন অবাধ্য কোনোকালে নয়। বর্ণে বর্ণে আদেশ পালন করেছিল শুনতে পাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাগান একেবারে সাফ। আগাছা, পরাগাছা, ফুলগাছ—সব সাফ। বদমায়েশি করে যে করেছিল তা নয়, ওই রকমই ওর বুদ্ধি। ঘোর-প্যাঁচ নেই। একবার এক জমিদার তার ছেলের বিয়েতে ওকে ব্যাগার ধরে নিয়ে যায়। ইঁদারা থেকে জল তুলতে হবে। জমিদার কার্পেট-পাতা বৈঠক-খানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে আলবোলায় তামাক টানছেন। বিরাট এক কলসী জল নিয়ে গোবর্ধন দ্বারদেশে এসে হাজির।

"জল কোথায় রাখব বাবু?"

অর্বাচীনটার এই প্রশ্নে জমিদারবাবু একটু কৌতুক বোধ করিলেন। আলবোলায় একটা টান দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—"আমার মাথায়।"

বিনা দ্বিধায় গোবর্ধন এগিয়ে গিয়ে বাধা দেবার পূর্বেই হুড়-হুড় করে সব জলটা ঢেলে দিলে তাঁর মাথায়। রসিকতার ধার ধারে না সে।

···এ হেন গোবর্ধন জুটল এসে শেষকালে আমার কাছে। আমার কিছু চাষ-বাস ছিল; গোবর্ধন একদিন সকালে দন্তবিকাশ করে এসে বললে—"আমাকে আপনি রাখেন, বাবু।"

"তুই যে জগদীশবাবুর ওখানে ছিলি?"

"আজ্ঞে, ওনারা বড় খ্যাচ-খ্যাচ করে।"

"তার আগে শীতলবাবুর কামতেও তো ছিলি কিছুদিন ?"

"আমার জেল হয়েছিল শুনে, রাখলে না।"

গোবর্ধনের হাসি আকর্ণ-বিস্তৃত হয়ে উঠল।

আমার লোকের দরকার ছিল, রাখলাম গোবর্ধনকে। দিন-তুই পরেই বোঝা গেল, লোকে কেন ওকে রাখছে না। গৃহিণী বললেন, "হাতির খোরাক!" হাতির মতো কাজও করে। সুতরাং গৃহিণীর আপত্তি সত্ত্বেও গোবর্ধনকে রাখলাম। মাইনে কত নেবে, তা কিছু ঠিক হ'ল না। তিনকুলে কেউ নেই, টাকার দরকারও ছিল না তার বিশেষ। তু'বেলা পেটভরে খেতে পেলেই গোবর্ধন সন্তুষ্ট।

বছরখানেক কাটল।

একদিন গোবর্ধন এসে ঘাড় চুলকে মাথা চুলকে বললে—"বাবু, তিন কুড়ি টাকা আমাকে দিতে হবে...."

আকাশ থেকে পড়লাম।

"তিন কুড়ি টাকা! কেন রে ?"

"আজ্ঞে, বিয়ে করব।"

"অত লাগবে ?"

"ওর কমে মেয়ে দিতে চায় না কেউ।"

ঘাড়টা একদিকে কাত্ করে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল: তার বিশাল বলিষ্ঠ বপুর দিকে চেয়ে আমি আর 'না' বলতে পারলাম না। এমন একটা সুস্থ সবল জোয়ান বিয়ে করবে না তো কে বিয়ে করবে! সেদিন একটা বিবাহ-সভায় গিয়েছিলাম। পাত্রের চেহারা দেখে হতাশ হয়ে পড়তে হ'ল। রোগা লিকলিকে দেহ, কোটরগত চক্ষু, গালের হাড় তুটো উঁচু, মুখময় ব্রণ। মহাসমারোহে বিয়ে করছে ছোকরা বিলিতী ব্যাণ্ড বাজিয়ে। ওই অপদার্থটার যদি বিয়ে করবার দাবি থাকে, গোবর্ধনেরও নিশ্চয় আছে।

গৃহিণী বললেন—"আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে। ও নিজে শোয় তো বারান্দায়, বউকে এনে রাখবে কোথা ?"

গোবর্ধনকে প্রশ্ন করলাম—"হ্যাঁ রে, বউকে এনে রাখবি কোথা ?"

"ঘর-টর বেঁধে লিব একটা ওই একটেরে।"

আমার বাড়ির সামনে জমি পড়ে ছিল খানিকটা, আঙুল দিয়ে তারই একটা কোণ দেখিয়ে দিলে গোবর্ধন।

"তাই আগে বাঁধ।"

বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে আর পোয়ালগাদা থেকে খড় নিয়ে সেই দিনই কুঁড়ে তুলে ফেললে গোবর্ধন। চমৎকার ছোট্ট কুঁড়েটি। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে এসে আমাকে বললে—"ছাখেন...."

এর পর আর কোনো আপত্তি টিকল না। বিয়ের জন্যে টাকা তাকে দিতেই হ'ল। এক বছর কোনো মাইনেও তো নেয়নি। কালোকোলো নধরকান্তি স্বাস্থ্যবতী বউ এল একটি কিছুদিন পরে।

বেশ কাটল কিছুদিন।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে বেশ কাজকর্ম করত। বউটাও বেশ খাটিয়ে। একদণ্ড চুপ করে বসে থাকত না। হয় ডাল ভাঙছে, নয় ঘুঁটে দিচ্ছে, না হয় কাপড় কাচছে। আর সমস্ত হাসিমুখে। বেশ চলছিল। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হ'ল। গোবর্ধনের কর্তৃত্ববোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ক্রমশ। পান থেকে চুন খসলেই সে বউকে শাসন করতে ছুটত—কখনও লাঠি নিয়ে, কখনও থান ইট নিয়ে। বউটা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিত আমার স্ত্রীর কাছে। গোবর্ধন দূর থেকে শাসাত—"আচ্ছা, দাঁড়া—মজা দেখাচ্ছি তোকে।" তখন আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তাম। গোবর্ধনকে বকলে সে ঘাড় গুঁজে চুপ করে থাকত, তারপর গজগজ করত আপন মনে এবং তার দু'দিন পরেই আবার তাড়া করত বউটাকে।

আসন্নপ্রসবা বউটা একদিন শুনলাম বাপের বাড়ি পালিয়েছে। গোবর্ধনকে প্রশ্ন করলাম—"পালাল কেন? হয়েছিল কী!"

"হবে আবার কী! দিয়েছিলুম একটা চাপড়।"

"গোঁয়ার-গোবিন্দ ভূত!"

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন আমার গৃহিণী। গোবর্ধন চুপ করে রইল। পনরো দিন কাটল। গোবর্ধনের বউ আর ফেরে না। গোবর্ধন বিমর্ষমুখে ঘুরে বেড়ায়।

আমার দারোগা বন্ধু বললেন—"নালিশ কর তুই। আমি তোর বউ আনিয়ে দিচ্ছি।"

গোবর্ধন নীরব।

উকিল বন্ধু বললেন – "বউ যদি না-ও আসে, ক্ষতিপূরণ পাবি।"

গোবর্ধন তবু কিছু বলে না।

আধুনিকমনা একজন মন্তব্য করলেন—"স্ত্রী হলেও সে তো মানুষ। তার সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার না করলে সে থাকবে কেন? গিয়ে মাপ চা।"

গোবর্ধন চুপ করে থাকে।

হঠাৎ খবর এল গোষর্ধনের ছেলে হয়েছে। পাঁচ ক্রোশ দূরে গোবর্ধনের শ্বশুরবাড়ি, কে একজন এসে খবর দিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে গোবর্ধন উধাও।

আমার আধুনিকমনা বন্ধুটি বললেন—"মাপ চাইতে গেছে বোধ হয়। মানুষ যতই মূর্খ হোক, তার সুপ্ত মনুষ্যত্ব একদিন-না-একদিন জাগরিত হবেই–"

অনেক রাত্রে গোবর্ধন ফিরল। হাতে ছোট্ট একটা ন্যাকড়ার পুঁটলি।

আমার স্ত্রী বললেন – "কি রে, ওটা কি?"

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে গোবর্ধন বললে – "বাছুরটাকে নিয়ে এলাম, গাই এবার আপনিই আসবে। আপনি একটু দুধের যোগাড় করেন দেখি –"

ন্যাকড়ার পুঁটলির মধ্যে দেখি গোবর্ধনের সদ্যোজাত শিশুটা!

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।

পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ।

কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।

খোস দাদ হাজা চুলকুনিতে লাগাবে।

চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।

এমনি কাঁচাই....

কিংবা ভেজে বেগুন-সহযোগে।

যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।

কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক – দাঁত ভালো থাকে।

কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশী হন।

বলেন—"নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না।"

কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।

আবর্জনা জমে এসে চারিদেকে।

শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ—সে আর-এক আবর্জনা।

হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

বলে উঠল—বাঃ, কী সুন্দর পাতাগুলি...কী রূপ! থোকা থো ফুলেরই বা কী বাহার...একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আক থেকে সবুজ সায়রে, বাঃ –"

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চ'লে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূর চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।
